# প্র ণ তি

## সেই সব বরণীয় শিক্ষক

কৃতীদের স্মৃতিকথা

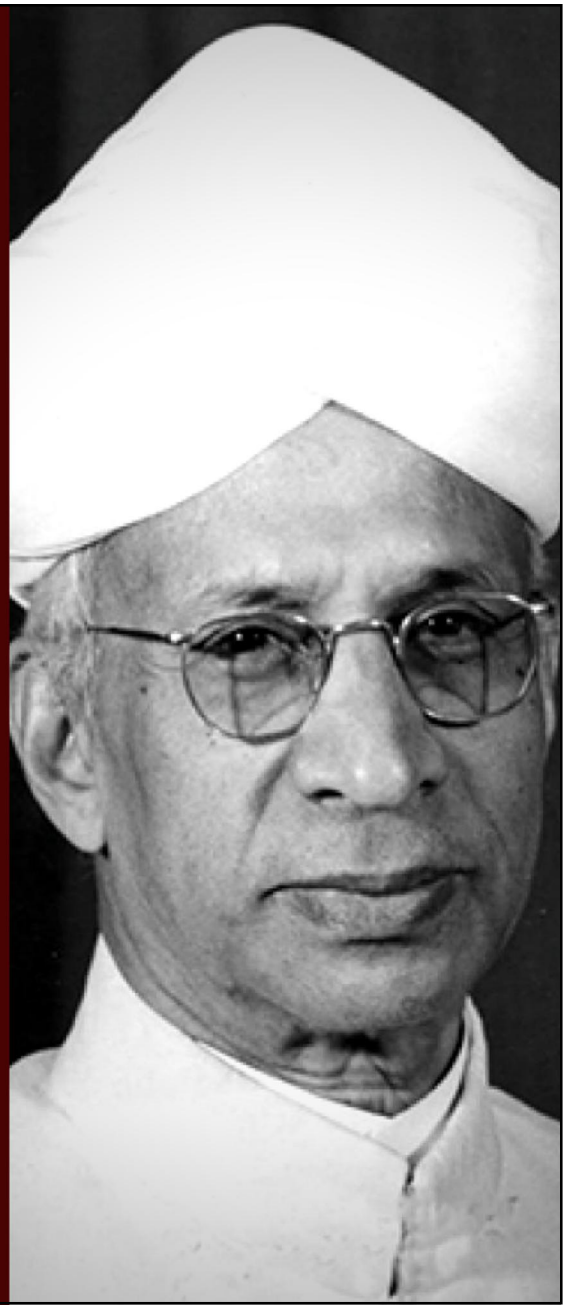

জাতীয় শিক্ষক দিবস

২০২১

Anusandhan
dreaming success

অনুসন্ধান

কলকাতা

# প্রণতি

## সেই সব বরণীয় শিক্ষক

কৃতীদের স্মৃতিকথা

**জাতীয় শিক্ষক দিবস**

**২০২১**

অনুসন্ধান

কলকাতা

# PRANATI

A collection of Teachers' Day memoirs
by 30 eminent persons

**1st Edition**
5 September, 2021

Published on behalf of **Anusandhan**-Kolkata
by Mr. Sahabul Islam Gazi
from Sama Bhaban, Srijan Park,
Nabapally, Barasat, N. 24 Pgs., PIN-700126

Ph : 9051270080, 8777688756
E-mail : anusandhan.kolkata@gmail.com

**Cover Design :**
Akash Parvez

**DTP**
Subhas Ghosh, Rupali Computer, Barasat

## সূচিপত্র


আমাদের কথা ৫

অনুসন্ধান : পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ৬

Vision, Mission, Goal & Objectives ৯

অনুসন্ধান শিক্ষা সম্মান ১১

যাঁরা আমাকে গড়েছেন ❐ সমর বাগচী ১৩

শিক্ষণ ও বীক্ষণ : সাধনা অনুক্ষণ ❐ ড. অশোক কান্তি সান্যাল ১৫

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আমার প্রিয় শিক্ষক ❐ রামরাম চট্টোপাধ্যায় ১৭

মনভুবনের কাণ্ডারী : আমার শিক্ষক সৈবুর রহমান ❐ ড. মুজিবর রহমান ১৯

আমার প্রিয় শিক্ষক ❐ ড. অমলেন্দু বসু ২১

আমার শিক্ষক ড. যোগব্রত রায় ❐ পদ্মশ্রী ড. বিমল রায় ২৩

আমার শিক্ষক ❐ পূর্ণেন্দু বসু ২৫

প্রিয় শিক্ষক ❐ ড. বাসব চৌধুরী ২৭

আচার্য কথা ❐ ড. নিখিল কুমার সিনহা ২৯

পিতৃদেব : আমার প্রথম শিক্ষক ❐ দিব্যগোপাল ঘটক ৩১

রুবিন স্যার ❐ ড. মতিয়ার রহমান খান ৩৩

আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক শচীনবাবু ❐ শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ৩৫

ট্রাম্পেটওয়ালা ❐ ড. শুভময় দাস ৩৭

আমার শিক্ষক ❐ চঞ্চলকুমার ঘোষ ৩৯

সুমন স্যার, খলিল স্যার ❐ ড. মানস প্রতিম দাস ৪১

প্রিয় শিক্ষক রাজরাখাল তরফদার ❐ ড. রাধাগোবিন্দ ঘোষ ৪৩

আমার বাবা, আমার শিক্ষক ❐ ধীমান শঙ্কর ৪৫

আমার প্রিয় শিক্ষক ❐ রবার্ট চার্লস ডেউড ধর (এস.জে.) ৪৭

As I think of an Ideal Teacher... ❐ Dr. Nipam Kumar Saikia ৪৯

আজও সাথে কালিকা প্রসাদ ❐ ঋষি চক্রবর্তী ৫১

আমার শিক্ষক ❐ সুদীপ্ত কুমার চক্রবর্তী ৫৩

রামকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য ❐ ড. রঞ্জিত কুমার সুর ৫৫

আমার প্রিয় শিক্ষক ❐ ড. চন্দন মিশ্র ৫৭

আমার শিক্ষক ❐ বাপি মজুমদার ৫৯

আমার হেডমাস্টারমশাই ❐ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় ৬১

আমার স্কুল আমার শিক্ষক ❐ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৩

'আমার স্কুল' থেকে 'আমাদের স্কুল' ❐ সজল রায়চৌধুরী ৬৫

ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি ❐ শুভজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৬৭

নিভৃত প্রাণের দেবতা ❐ তাপস মুখোপাধ্যায় ৬৯

যাঁদের কাছে শিখেছি ❐ প্রশান্ত ভট্টাচার্য ৭১


---

*Instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5 September is observed as Teachers' Day.*

*— Dr. Sarvepalli Radhakrishan*

# আমাদের কথা

অনুসন্ধান-এর প্রথম প্রকাশন 'প্রণতি' কোবিদ সমাজে উপস্থাপিত হল।

কোভিড আবহে, শিক্ষক দিবসের পুণ্য অবসরে, স্বনামধন্য কিছু মানুষ শ্রদ্ধায় মমতায় স্মরণ করেছেন তাঁদের শিক্ষকদের। বিদ্যার প্রাচুর্যে, কর্মদক্ষতায়, পদমর্যাদার গাম্ভীর্যে তাঁরা অনেকেই ছাড়িয়ে গেছেন তাঁদের আচার্যদের। শিক্ষক হিসাবে এটা তাঁদের পরম প্রাপ্তি। শিক্ষকের কাজই তো নিজে জ্ব'লে শিক্ষার্থীর যাত্রাপথ আলোকিত করা, আর তার মধ্যেই সাফল্যের আনন্দ খুঁজে পাওয়া। সেই সব বরণীয় শিক্ষক ও তাঁদের কৃতী ছাত্রদের আমরা প্রণতি জানাই। এমন কত না মনভুবনের কারিগর ছড়িয়ে আছেন চরাচর জুড়ে, অনুল্লেখ অবহেলায়। জাতীয় শিক্ষক দিবসের শুভ অবসরে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি তাঁদেরও।

নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতী যে সব মানুষ শিক্ষক দিবসে অনুসন্ধান-এর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক সম্মাননা পাচ্ছেন, প্রণতি-র পাতায় তাঁদের স্থান দিতে পেরে আমরা ধন্য হয়েছি। পুস্তিকায় যোগ করা গেল অনুসন্ধান-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গত চার বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, সাংগঠনিক কমিটি ও উপসমিতিগুলির বিবরণ এবং বিভিন্ন উদ্যোগ ও অনুষ্ঠানের ছবি।

অতিমারী ও কাল-স্বল্পতার কারণে প্রকাশনার কাজ সহজসাধ্য ছিল না। সম্ভব হয়েছে সংশ্লিষ্ট উপসমিতির উৎসাহ ও উদ্যমে। কিছু ত্রুটি, অলঙ্করণের খামতি থেকে গেল। মুদ্রিত আকারে প্রকাশের আগে ঠিক করে নেওয়া যাবে। এ বিষয়ে গঠনমূলক প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হবে।

পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী, লেখাগুলির মাপে যথাসম্ভব সাযুজ্য রাখার প্রয়োজনে, কিছু লেখায় পরিবর্ধন পরিবর্জন করতে হয়েছে, কিন্তু লেখকের প্রথাগত অনুমতি নেওয়ার সময় পাওয়া যায়নি। আশা করি বুধজন নিজগুণে ক্ষমা করবেন, এবং এ বিষয়ে যে কোনো বক্তব্য নির্দ্বিধায় বলবেন, যাতে মুদ্রণের সময় ঠিকঠাক করে নেওয়া যায়।

যাঁর কথা না বললেই নয়, প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট শিক্ষক নায়ীমুল হক সাহেবের তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতা ছাড়া এই প্রকাশনা সম্ভব হত না।

সকলের সুস্থ জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ সহ —

প্রকাশনা উপসমিতির পক্ষে —

বারাসাত, ০৫.০৯.২০২১ **শেখ আলী আহসান**



# অনুসন্ধান-কলকাতা

**পরিচিতি :** 'অনুসন্ধান-কলকাতা' শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক কার্যক্রম-কেন্দ্রিক একটি অরাজনৈতিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।

**যাঁরা যুক্ত আছেন :** মূলত অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত কিছু বিশিষ্ট শিক্ষক, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। সেই সঙ্গে আছেন বিশিষ্ট শিক্ষা-প্রশাসক, গবেষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, মনোবিদ, প্রযুক্তিবিদ। 'অনুসন্ধান'-এর সন্ধানী ও পৃষ্ঠপোষক তালিকা দীর্ঘ, এবং তা রাজ্য ও দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে বিস্তৃত।

## সূচনা ও কার্যাবলী : সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

ভাবনার শুরু ২০১৮ সালের মে মাস নাগাদ। বিশিষ্ট শিক্ষা প্রশাসক মাননীয় দিব্যগোপাল ঘটক, বিশিষ্ট শিক্ষক ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সজল রায়চৌধুরী, শেখ আলী আহসান, পঙ্কজ মহাপাত্র, নায়ীমুল হক, সাহাবুল ইসলাম গাজী, আসাদুজ্জামান, পান্থ মল্লিক প্রমুখ গুণীজনের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং আরো অনেকের সম্মিলিত উদ্যোগে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়। পাশে দাঁড়ানোর জন্য সমমনোভাবাপন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে আবেদন জানানো হলে তাঁরা যথাসম্ভব সাহায্য করতে সম্মত হন।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার যেসব বিদ্যালয়ের সঙ্গে পূর্ব পরিচিতি ছিল সেই সব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা সাদর আহ্বান জানান। অতঃপর মুর্শিদাবাদ, মালদা, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বেশ কিছু বিদ্যালয়ে সফর সম্পন্ন হয়। শুরু হয় কাজ।

ওই বছরেই নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক সহ নম শ্রেণিকে সংযুক্ত করে তাদের জন্য প্রতি মাসে বিশেষ পরীক্ষা নেওয়া এবং ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়।

২০১৯ সালে বছরভর দফায় দফায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে বৈঠক হয়। এইসব বৈঠকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল যে বিষয়টি সেটি হল বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনার প্রতি ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবকদের ক্রমবর্ধমান অনীহা, এবং এর কারণ ও সমাধান অনুসন্ধান। এছাড়াও, 'নিউ এডুকেশন পলিসি' ভবিষ্যৎ শিক্ষাব্যবস্থার উপর কী প্রভাব ফেলতে চলেছে এবং সেই প্রেক্ষিতে আমাদের প্রস্তুতি কেমন হওয়া দরকার তা নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে, উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায়।

২০২০ সালের কোভিড-১৯ অতিমারীর প্রকোপ শুরু হলে স্কুলের স্বাভাবিক পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এই সঙ্কটকালে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ইত্যাদি চালু রাখা ও গৃহবন্দী অবস্থায় মৃত্যু ও অসুস্থতার অবিরল ভয়াবহ সংবাদ-প্রবাহের মধ্যে শিশু-কিশোরদের মনোবল অটুট রাখা কীভাবে সম্ভব এই বিষয়ে জরুরী

ভিত্তিতে আলোচনার পর স্থির করা হয় ভার্চুয়াল ক্লাসের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও যথাসম্ভব সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। প্রাথমিকভাবে দশম শ্রেণির জন্য প্রাত্যহিক ক্লাস চালু করা হয়, যা ২০২০ সালের মে মাসে শুরু হয়ে এখনো চলছে।

এই বছরেই শুরু হয় মূলত নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবিষয়গুলির প্রতি আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য ভিন্ন আঙ্গিকে বিশেষ কর্মশালা। সম্পন্ন হয় গণিত, জীবন বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান এবং ইংরেজি বিষয়ের কর্মশালা।

ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক অবসাদ কাটাতে আয়োজিত হয় বিশেষ মোটিভেশনাল সেশন। এ যাবৎ আয়োজিত চারটি সেশনে উপস্থিত থেকেছেন প্রখ্যাত শিক্ষামনোবিদ ডাঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সঞ্জিত সেনগুপ্ত, অরিজিৎ রায় প্রমুখ।

এতদিন চলছিল 'A Group of Teachers' এই নামে। এতসব কর্মকাণ্ড সফলভাবে চলল বলেই দেখা দিল প্রথাগত নামকরণের প্রয়োজনীয়তা।

২০২১ সালের প্রথম দিকে স্বনামধন্য বিজ্ঞানী সমর বাগচী মহাশয় সংগঠনের নাম রাখলেন—'অনুসন্ধান'। লোগো নির্ধারিত হল আরো কিছু পরে—২৬ জুলাই তারিখে, আর একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. মতিয়ার রহমান খান সাহেবের তদারকিতে। নাম ও লোগো রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া চলছে।

'অনুসন্ধান'—এই ব্যানারে ২০২১ সালে পড়াশোনার পাশাপাশি পালিত হয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান —

- **২৮ ফেব্রুয়ারি** পালিত হয়েছে বিজ্ঞান দিবস। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শুভানুধ্যায়ী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।
- **১৪ মার্চ** সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে 'আইনস্টাইন জন্মদিবস পালন' অনুষ্ঠান হয়। সেখানে বিজ্ঞান দিবস অনুষ্ঠানের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- **৫ জুন** পরিবেশ দিবস উপলক্ষে অনলাইন অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। বিজয়ীদের শংসাপত্র ও পুরস্কার ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
- **১ জুলাই** পালিত হয় চিকিৎসক দিবস—ড. বিধানচন্দ্র রায় স্মরণে।
- **১৮ জুলাই** প্রথম বাঙালি মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর জন্মদিবস পালন করা হয়।
- **১ আগস্ট** মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসার প্রান্তিক পরীক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের অনলাইন সম্বর্ধনা এবং আলাপচারিতা আয়োজিত হয়।
- **৯ আগস্ট** নাগাসাকি দিবস ও ভারত ছাড়ো আন্দোলন দিবস পালিত হয়।
- **২৯ আগস্ট** দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিশুবিকাশ একাডেমিতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।
- **৫ সেপ্টেম্বর** পালন করা হয় শিক্ষক দিবস। সম্বর্ধিত হন বিশিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ। প্রকাশিত হয় 'অনুসন্ধান'-এর প্রথম পুস্তিকা 'প্রণতি', যেখানে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা স্মরণ করেছেন তাঁদের প্রিয় শিক্ষকদের।



**ছোটদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা : বিচারকমণ্ডলী**—সৈয়দা কানিজ মুস্তাফা, পিংকি দাস, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, আখের সর্দার, সায়নি কর্মকার, সুহানা তাবাসসুম। তত্ত্বাবধানে : পিংকি দাস।

**বিজয়ী :** প্রথম—রাইহান আহমেদ (একাদশ শ্রেণি), আল-আমীন মিশন একাডেমি, নয়াবাজ। দ্বিতীয়—আর্যদীপ দাস (নবম শ্রেণি), মালদা উমেশ চন্দ্র বাস্তুহারা বিদ্যালয়। তৃতীয়—শ্রেষ্ঠার্জিতা সরকার (অষ্টম শ্রেণি), দিনহাটা গার্লস হাই স্কুল।

## কার্যনির্বাহী কমিটি

**প্রধান পৃষ্ঠপোষক :** শ্রী সমর বাগচী, **প্রধান উপদেষ্টা :** অধ্যাপক মতিয়ার রহমান খান, **সভাপতি :** শেখ আলী আহসান, **সহ-সভাপতি :** ড. দেবব্রত মুখার্জী (কাটোয়া), ড. দেবব্রত মুখার্জী (কলকাতা), ড. নিপম কুমার সইকিয়া (অসম), ড. শুভময় দাস (কলকাতা), ড. কমল কৃষ্ণ দাস (মালদা), ড. স্বাগতা বসাক (কলকাতা)।

**সম্পাদক :** সাহাবুল ইসলাম গাজী, **সহ-সম্পাদক :** শ্রী গৌরাঙ্গ সরখেল, শ্রীমতী মিতালি মুখার্জী, **কোষাধ্যক্ষ :** আখের সর্দার, **গবেষণা বিভাগের আহ্বায়ক :** শ্রী তমাল ঘড়াই, শ্রী অনির্বাণ ভট্টাচার্য, শ্রীমতী চন্দ্রিমা সেন, নাজিরুল হক, **প্রযুক্তি বিভাগের আহ্বায়ক :** নাজিমুল হক, **চিকিৎসা বিভাগের আহ্বায়ক :** ডাঃ কুনালকান্তি মজুমদার

**সদস্য :** নায়ীমুল হক, ড. নওয়াজেশ মণ্ডল (মেম্ফিস, আমেরিকা), ড. শামসুল আলম, কাজী নিজামুদ্দিন, আশরাফুল হক (নিউ দিল্লি), ইয়াসিন মণ্ডল (নিউ দিল্লি), শ্রীমতী পিঙ্কি দাস, শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা শীল, সেকেন্দার মণ্ডল, আসাদুজ্জামান মণ্ডল, সায়ন কর্মকার, নাফিসা ইসমাত, প্রত্যুষ মুখার্জী, মাঈসুরা তৈয়েবা।

## প্রকাশনা উপসমিতি

**আহ্বায়ক :** ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (কাটোয়া), **প্রধান উপদেষ্টা :** ড. মুজিবর রহমান, **উপদেষ্টা মণ্ডলী :** ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (কলকাতা), অধ্যাপক ড. মতিয়ার রহমান খান, ড. নিপম কুমার সাইকিয়া, ড. কমলকৃষ্ণ দাস, **সম্পাদনা সহযোগী:** প্রশান্ত ভট্টাচার্য, তাপস মুখোপাধ্যায়, সাহাবুল ইসলাম গাজী, গৌরাঙ্গ সরখেল, শর্মিষ্ঠা শীল, নায়ীমুল হক, অঞ্জন মজুমদার, আপ্পু পাল, আকাশ পারভেজ, **সম্পাদক :** শেখ আলী আহসান।

## শিক্ষক দিবস উদযাপন উপসমিতি

গৌরাঙ্গ সরখেল, আখের সর্দার, পিংকি দাস, পলাশ ঘোষ, অনিবাণ ভট্টাচার্য, নাজিমুল হক, প্রত্যুষ মুখার্জী, নাফিসা ইসমাত, সায়ন কর্মকার, মাঈসুরা তৈয়েবা, **যোগাযোগ :** প্রত্যুষ মুখার্জী, গৌরাঙ্গ সরখেল, সাহাবুল ইসলাম গাজী, ওয়াসেকা রহমান, **অনুষ্ঠান উপস্থাপনা :** প্রত্যুষ মুখার্জী ও নাফিসা ইসমাত।

# Anusandhan-Kolkata

## Vision, Mission, Goal & Objectives

### Vision

The vision of Anusandhan-Kolkata is to build a better world for generations to come by exploring and nurturing talents.

### Mission

Our mission is to ignite, inspire, and empower promising young minds so that they become responsible global citizens.

### Goals

— To help improve the school education standard

— To increase interest in STEAM disciplines

— To help students delve deeper into a wide range of knowledge, acquire skills and understanding of subjects

— To prepare school children for the future challenges

— To motivate students to be innovative

### Objectives

1. To mentor teachers through participatory discussion and demonstration on modern learning tools and techniques so that they enjoy teaching and thereby they increase students' interest in learning
2. To attract young minds towards STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) disciplines through innovative and interactive teaching and learning methodologies
3. To organize pertinent academic programmes on Science Day, Teachers' Day, Children's Day, Women's Day, Doctors' Day etc.
4. To create platforms for Student-Teacher interaction, Teacher-Teacher interaction, debates, seminars, workshops, etc. on contextual areas and emerging issues
5. To undertake programmes for the popularization of science and technologies for the greater benefit of the society
6. To bring out publications (offline/online) — newsletter, magazines, bulletins, leaflets etc.
7. To create awareness on health, food, water, and climate issues
8. To recognize contribution of students, teachers, social workers etc.
9. To extend supports to the economically weaker students to reach their cherished goals
10. To organize events that alleviate anxiety and fear of examinations, and distressed and depressed conditions in the events of unforeseen situations
11. To guide and inspire students and their parents so that the students can make the right choice for their career at the early years of schooling and help them prepare accordingly
12. To integrate as many schools, teachers, and students (in India and abroad) as possible for achieving the goals

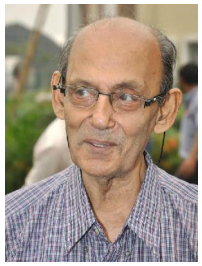

**সমর বাগচী :** *বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম (BITM)-এর সাবেক অধিকর্তা। বর্ষীয়ান এই বিজ্ঞান সাধকের অধিকাংশ সময় কাটে ছাত্র-শিক্ষক সান্নিধ্যে। মার্গসঙ্গীত, কাব্যপাঠ, পাহাড় ভ্রমণে খুঁজে পান প্রাণের আরাম। না বুঝে মুখস্থ করা, আর খাতায় উগরে দেওয়া—এই ক্ষতিকর বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থার নিরলস কাজ করে চলেছেন। এই লক্ষ্যে BITM-এ তাঁর বিভিন্ন কাজ ও কলকাতা দূরদর্শনের অনুষ্ঠানগুলি নজির হয়ে আছে। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯২ সালে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন।*

**দিব্যগোপাল ঘটক :** *অবসরপ্রাপ্ত উপশিক্ষা অধিকর্তা। দীর্ঘদিন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ও ডি পি ই পি-তে ডেপুটি স্টেট প্রজেক্ট ডিরেক্টর ছিলেন। শিক্ষার নতুন ধারা নিয়ে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রয়োগ পদ্ধতির উদ্ভাবন, মডিউল তৈরি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, আধুনিক শ্রেণিকক্ষের মডেল নির্মাণ, নিবন্ধ রচনা—এইসব কাজে সবিশেষ আগ্রহ ও পারদর্শিতা।*

**ড. মানস প্রতিম দাস:** *আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিভাগের অনুষ্ঠান প্রযোজক, বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে লেখালেখি করছেন। বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে তাঁর অবদান নানা মহলে স্বীকৃত।*

**জোসনারা বেগম** — পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত শিমুলগাছি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা সম্পন্ন করার পর কাটোয়া ডি ডি সি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। অতঃপর তারকেশ্বর চক্রে শিক্ষা দপ্তরের চাকুরিতে যোগ দেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কাজ করার পর বর্ধমান জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষার প্রসারে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন অবদান উল্লেখযোগ্য।

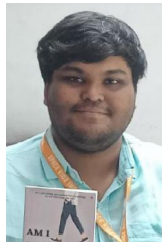

**রিফাত শাহরুখ** — তামিলনাড়ুর পালাপাত্তি নামক ছোট্ট শহরে বেড়ে ওঠা। অষ্টম শ্রেণিতে পড়াকালে পিতৃহারা এবং স্টুডেন্ট রিপোর্টার হিসাবে খবরের কাগজে যোগদান। মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম স্যাটেলাইট 'কালাম স্যাট' নির্মাণ। মাত্র ৬৪ গ্রাম ওজনের এই স্যাটেলাইটের প্রধান কাজ হল থ্রি ডি প্রিন্টেড কার্বন ফাইবার ক্ষমতা প্রদর্শন করা। এটি তিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এ পি জে আব্দুল কালামকে উৎসর্গ করেন। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা NASA এই স্যাটেলাইটকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

**ঋষি চক্রবর্তী:** *লোকগীতির জনপ্রিয় শিল্পী। জন্ম ও বেড়ে ওঠা মালদা জেলার চাঁচলে। এই জেলার বিখ্যাত সঙ্গীত গম্ভীরা দিয়ে হাতেখড়ি ঋষির। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে কলকাতা শহরে কালিকাবাবুর সাহচর্যে টিভিতে আত্মপ্রকাশ। বর্তমানে বাংলা লোকগীতি পরিবারের অন্যতম সদস্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।*

# যাঁরা আমাকে গড়েছেন

## সমর বাগচী

আমি সমর বাগচী। বয়স ৮৯ বছর। এই বয়সে স্মৃতিতে তেমনভাবে সবকিছু নেই। তবে আমার জীবনে এমন কিছু শিক্ষক মহাশয়কে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে যাঁদের কথা এখনো ভুলতে পারিনি। তাঁদের প্রভাব আমার জীবনে এমন ছাপ ফেলে গেছে যার ফলে বহুমুখী জীবনের আঙিনায় আমি নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছি। এখানে আমি অনেকের মধ্যে বিশেষ কয়েকজনের কথা স্মরণ করতে চাই।

প্রথমে আমি বলব আমার প্রথম শিক্ষক সুবিমল চন্দ্র বারারী স্যারের কথা। আমার জন্ম বিহারের পূর্ণিয়ায়। চাকরিসূত্রে বাবার ট্রান্সফার হলে আমরা সপরিবার চলে আসি দুমকা শহরে, যেটি এখন ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত। দুমকা তখন বাঙালি-অধ্যুষিত শহর। ওখানকার জেলা স্কুলে ভর্তি হলাম। সুবিমলবাবু মূলত ভূগোলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি এতটাই আকর্ষণীয় ছিল যে ভূগোল বিষয়টি ভালবেসে ফেললাম। সেই সাথে সার্বিকভাবে পড়াশোনার প্রতি বিশেষ আগ্রহ জন্মাল। তিনি শুধু স্কুলে পড়াতেন তা নয়, বাড়িতেও পড়াতেন। তার জন্য কোন টাকা-পয়সা নিতেন না। আমি যখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি এবং বাবার সঙ্গে মুঙ্গেরে থাকতে হচ্ছে, তখন খবর পেলাম তিনি মারা গেছেন। শুনে খুব দুঃখ পেলাম। কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার, ৩০ বছর পর আবার শুনলাম তিনি বেঁচে আছেন এবং কলকাতায় বসবাস করছেন। আমি তাঁকে খুঁজে বের করলাম। আবার নতুনভাবে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি হল। এই বন্ধুত্ব অনেকদিন ধরে চলেছিল। তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। বেহালায় যখন বাড়ির কাছাকাছি থাকতেন তখন তিনি তাঁর ভাগ্নেকে প্রথম তলায় থাকতে দিয়েছিলেন। সেই ভাগ্নে পরবর্তীকালে তাঁকে সেই বাড়ি থেকে প্রায় জোর করেই বের করে দিয়েছিল। তারপর তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি কিছুদিন থাকার পর তাঁর এক ডাক্তার ছাত্র তাঁকে পাটনায় নিয়ে গেছিলেন এবং পরম যত্নে তাঁকে আমৃত্যু দেখভাল করেছিলেন। কর্মসূত্রে যখন আমি পাটনায় সায়েন্স মিউজিয়াম তৈরির কাজে যেতাম তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসতাম। তাঁর পড়ানোর একটা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ না করে



পারছি না। তিনি গান শুনিয়ে পড়ানোর পরিবেশ তৈরি করে নিতে পারতেন।

আমি যখন স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলাম তখন আমাকে একদম গাঁইয়া মনে হত। বিপিনবাবুর সংস্পর্শে এসে কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হলাম। পড়ানোর মাঝে মাঝে কবিতা বলতেন। বাংলা কবিতা, ইংরেজি কবিতা। তাঁর সংস্পর্শে আমি নতুনভাবে শিক্ষিত হলাম।

আমার জীবনের আর একজন শিক্ষক ছিলেন সুব্রত রায়। তিনি সেতার বাজাতেন চমৎকার। তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি দেশি-বিদেশি মার্গ সঙ্গীতের শিক্ষা। তিনি ছিলেন ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ ঘরানার শিল্পী। পরে তিনি অর্থনীতির চাকরি নিয়ে মুম্বাই চলে গেলেন, কিন্তু তাঁর প্রভাব আমার জীবনে রয়ে গেল।

কার্ল মার্কস-এর লেখা বই পড়েও আমি নিজেকে সমৃদ্ধ করেছি, তাই তিনিও আমার শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার সারা জীবন জুড়ে আছেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকেও আমি শিক্ষিত হয়েছি। নাটক দেখা, নাটক বোঝার শিক্ষা নিয়েছি শম্ভু মিত্রের নাট্যকর্ম থেকে। তাই তিনিও আমার নাট্যপ্রেমের শিক্ষক। সিনেমা দেখে সত্যজিৎ রায়কে জানলাম। তাঁর জীবনদর্শন আমাকে সমাজ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে ভাবতে শেখালো।

অবশেষে বলব—এই সকল শিক্ষক ও তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা আমার জীবন ও মননকে প্রভাবিত করেছে, যার ফলে আমি নিজেকে একজন সমাজকর্মী, বিজ্ঞানকর্মী, পরিবেশকর্মী ও গণ-আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে পেরেছি। তাঁদের এই অবদান প্রতিনিয়ত স্মরণ করি, আর এই ব্রত নিয়ে পথ চলি যে আমার শরীরে যতদিন প্রাণ থাকবে সমাজের জঞ্জাল সাফ করার কাজে নিয়োজিত রাখব নিজেকে।

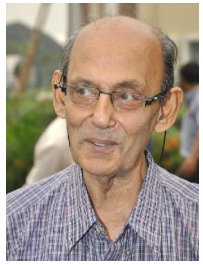

**লেখক পরিচিতি**—*বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম (BITM)-এর সাবেক অধিকর্তা। বর্ষীয়ান এই বিজ্ঞান সাধকের অধিকাংশ সময় কাটে ছাত্র-শিক্ষক সান্নিধ্যে। মার্গসঙ্গীত, কাব্যপাঠ, পাহাড় ভ্রমণে খুঁজে পান প্রাণের আরাম। না বুঝে মুখস্থ করা, আর খাতায় উগরে দেওয়া—এই ক্ষতিকর বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থার নিরলস কাজ করে চলেছেন। এই লক্ষ্যে BITM-এ তাঁর বিভিন্ন কাজ ও কলকাতা দূরদর্শনের অনুষ্ঠানগুলি নজির হয়ে আছে। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯২ সালে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন।*

# শিক্ষণ ও বীক্ষণ : সাধনা অনুক্ষণ

## ড. অশোক কান্তি সান্যাল

শিখছি তো জন্ম থেকেই। প্রথম শিক্ষক প্রকৃতি, দ্বিতীয় শিক্ষক বাবা-মা। তারপর কত না শিক্ষকের স্নেহচ্ছায়ায় ধন্য হয়েছি। এঁদের মধ্যে একজনের কথা বিশেষভাবে বলতে চাই—অধ্যাপক অমলেশ চৌধুরী।

ভাবনার জগতে পরিবর্তন আনতে লাগে শুধু একটি মুহূর্ত। প্রয়োজন একটিমাত্র মানুষের সংস্পর্শ। তেমনই সংযোগ ঘটেছিল ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি একদিন, বঙ্গবাসী কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের গবেষণাগারে।

আমি তখন ঐ বিভাগের ছাত্র, কিন্তু একেবারেই নতুন। প্রাণীবিদ্যায় অনার্স নিয়েছি। সেই ব্যাপার একটি জিজ্ঞাসা ছিল। শহরতলির আনস্মার্ট ছেলে। দুরুদুরু বুকে কম্পিত পায়ে স্যারের গবেষণাগারে উপস্থিত হলাম। স্যার বোধহয় আমার অসহায় অবস্থা বুঝে বললেন, 'বলো কি বলবে।' তাঁর আন্তরিক কণ্ঠস্বরে সাহস পেয়ে স্যারকে বক্তব্য বললাম। স্যার ধীরভাবে আমাকে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর বুঝিয়ে দিলেন আর বললেন, 'কোন দরকার হলে আমার কাছে বা অন্য স্যারদের কাছে যাবে।' সেইদিন এবং সেই শুভ মুহূর্তে আমার অন্তরে স্যারের প্রতি যে শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং অনুরাগের জন্ম হয়েছিল সবই আজও সমভাবে বিদ্যমান।

অনাড়ম্বর জীবন-যাপন ছিল স্যারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আড়ম্বর ছিল তাঁর জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে। তিনি গবেষণা শুরু করেছিলেন আদ্যপ্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস ও জীবনধারা বিষয়ে। অন্তহীন অনুসন্ধিৎসা ছিল তাঁর সমুদ্রবিজ্ঞান ও প্রাণীবিদ্যার সকল বিষয়ে। ফলে কোনো প্রশ্নের উত্তর জানতে অধ্যাপক চৌধুরীর শরণাপন্ন হলে সমস্যার সমাধান নিশ্চিত ছিল। বিদ্যা বিনয় দান করে। এই আপ্তবাক্যের সত্যতা লক্ষ্য করেছি স্যারের জীবনশৈলীর পরতে-পরতে। পাঁচ দশকের বেশী সময় স্যারের সংস্পর্শে ছিলাম কিন্তু কোনদিন তাঁকে রুঢ় বা অশালীন আচরণ করতে দেখিনি। তাঁর মত মৃদু ও মিষ্টভাষী মানুষ খুব কমই দেখেছি। কখনো তাঁকে দেখিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র এবং দেশভেদের প্রেক্ষিতে ছাত্রদের সাথে ব্যবহারের তারতম্য। তাঁর ভেদাভেদহীন ছাত্র-দরদী মনোভাব ছাত্রের কল্যাণসাধনের ক্ষেত্রে বহু সময় নানাভাবে প্রকাশিত হতে দেখেছি। দুঃস্থ-দুর্দশাগ্রস্ত ছাত্রদের সাধ্যমত সাহায্য করে তিনি তৃপ্ত হতেন বলে



আমার বিশ্বাস। তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ছিল নব নব রূপে প্রাপ্ত গবেষণালব্ধ ফলকে মানুষের জীবনধারণের মান উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা। এই অদম্য ইচ্ছার ফলে সাগরদ্বীপে নিজের মায়ের স্মরণে সুষমাদেবী মেরিন রিসার্চ সেন্টার তিলে তিলে গড়ে তোলেন। সমুদ্রবিজ্ঞানের গবেষণা কেন্দ্রটি দেশে-বিদেশের সমুদ্রবিজ্ঞানীদের কাছে পরিচিত এবং বহু বিজ্ঞানী এবং গবেষক এখানে থেকে গবেষণার কাজ করছেন। আমিও অনেক রাত কাটিয়েছি এই কেন্দ্রে। পূর্ব ভারতে সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ে পঠন-পাঠনের সুযোগ না থাকায় অধ্যাপক চৌধুরী নিজ উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর বিভাগ শুরু করেন। তিনি বহু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা ও সরকারি সংস্থার ফেলো ও সদস্য ছিলেন। তিনি কয়েকটি উচ্চমানের সরকারি সংস্থা দ্বারা 'লাইফ টাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ডে' ভূষিত হয়েছেন। আমিও পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের তরফ থেকে স্যারকে পুরস্কার প্রদান করে নিজেকে ধন্য করেছি। স্যারের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে ৬৭ জন ছাত্র-ছাত্রী পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করার পরেও গবেষণার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। নব্বই বছর বয়সে ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ তাঁর মৃত্যু হয়। সুন্দরবন তাঁকে এমনভাবে টানত যে মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি সেখানে গিয়েছেন। প্রকৃতির গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে আজীবন অন্বেষণ চালিয়ে জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তাকে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে সমর্পণ করে গেছেন।

**লেখক পরিচিতি**— *কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৭৩ সালে সরকারি কলেজের অধ্যাপক হিসাবে। এরপর ১৯৭৫ সালে ভারত সরকারের পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন দপ্তরের অধীনে কলকাতায় অবস্থিত ভারতীয় প্রাণী সর্বেক্ষণ (জেড. এস. আই)-এ বিজ্ঞানী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি মৃত্তিকাস্থিত জীবসমূহ বিশেষ করে মাইট, কোলেম্বোলা ও অন্যান্য পতঙ্গ, জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণ, পরিবেশ দূষণ, ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করেন এবং বহু গবেষণাপত্র এবং বই প্রকাশ করেছেন। ড. সান্যাল কয়েকটি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন ও গবেষণা করেছেন। তিনি ভারতের ১৯তম কুমেরু অভিযানে সদস্য ছিলেন এবং ঐ মহাদেশ থেকে কয়েকটি নতুন প্রজাতির মাইট আবিষ্কার করেন। ১৯১১ সালে জেড. এস. আই থেকে অবসর গ্রহণের পরে 'এমিরেটাস সায়েন্টিস্ট' এবং দীর্ঘসময় পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের চেয়ারম্যান পদে আসীন ছিলেন।*

# নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আমার প্রিয় শিক্ষক

## রামরাম চট্টোপাধ্যায়

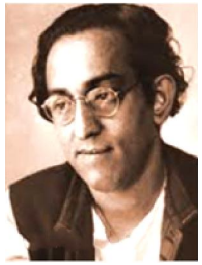

‘এ ধরা গোরস্থান—
মরণের ভিতে স্মরণের ঢিপি দু’দিনে ভূমি সমান।’

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা ‘ঘুমের ঘোরে’ কবিতা পড়াচ্ছেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী, সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। দেড় ফুট উঁচু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে স্মিত মুখে ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে কবিতার লাইনগুলি ব্যাখ্যা করছেন। উল্লেখ করছেন দেশি বিদেশি সাহিত্যের প্রসঙ্গ। পাণ্ডিত্য যে এত মধুর হয় তাঁকে না শুনলে না দেখলে ভাবতেও পারতুম না।

তাঁর পিতৃদত্ত নাম তারক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। গুগল অনুসারে অবশ্য তারকনাথ। লেখকরূপে আত্মপ্রকাশের সময়ে তারক অংশটি বাদ দিয়ে শুধুই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এই নামে তিনি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, ‘সুনন্দ’ ছদ্মনামে বিখ্যাত জার্নাল লেখক। দেশ পত্রিকায় তাঁর সর্বশেষ জার্নালে নিজের আসন্ন মৃত্যুর ঘোষণা করে গিয়েছিলেন। মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে কর্মরত অবস্থায় তাঁর চলে যাওয়া।

১৯৬৫ সাল। তখন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই প্রথম তাঁকে দেখি। অসাধারণ ভালো শিক্ষক। যখন পড়াতেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবিষ্ট হয়ে তাঁর কথা শুনতাম। বহু সময় দেখেছি অন্য বিভাগের ছাত্ররাও তাঁর ক্লাস করতে এসেছে। এম এ পাশ করার পর তাঁরই উৎসাহে সাহিত্য নিয়ে গবেষণা শুরু করি। আবার তাঁরই নির্দেশে গুরুদাস কলেজে অধ্যাপনা। বলেছিলেন, ‘তুমি



কাদের পড়াচ্ছ সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা তুমি তোমার সেরাটা দিতে পারছ কিনা সেটাই দেখা’র।

বহুবার তাঁর বাড়ি গিয়েছি। শেষবার তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁর কণ্ঠে শুনি , ‘বড় গ্লানি নিয়ে বেঁচে আছি।’ না, তারপর আর যেতে পারিনি কখনো। তবে নিঃসংশয়ে বুঝেছি, ‘স্মরণের ঢিপি’-র ভূমি দু’দিনে সমান হয়ে যায় না, যদি তা মন্দির বা মসজিদ হয়ে গড়ে ওঠে।

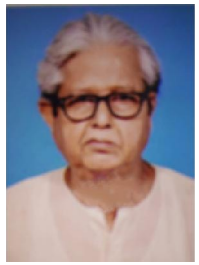

**লেখক পরিচিতি**—*জন্ম হুগলি জেলার খামারগাছি গ্রামে। জ্ঞানচর্চার ধারা বয়ে এসেছে কয়েক পুরুষ ধরে। প্রপিতামহ দুর্গাচরণ ন্যায়তীর্থ-এর গুণগ্রাহী ছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। মেধাবী ছাত্র। এম এ পাশ করে কর্মজীবন শুরু হয়। পরে গুরুদাস কলেজে বাংলার অধ্যাপক। বিভাগীয় প্রধান হিসাবে অবসর নেন। জ্ঞানচর্চা আর মানুষের সান্নিধ্যের মধ্যেই জীবনের আনন্দ খুঁজে পান।*

# মনভুবনের কাণ্ডারী : আমার শিক্ষক সৈবুর রহমান

## ড. মুজিবর রহমান

আমার এই সাড়ে সাত দশকের জীবনের প্রতিনিয়তই আমি শিক্ষার্থী। যাঁদের কাছে পাথেয় সংগ্রহ করেছি, তাঁদের মধ্যে একজন, আমার শৈশবের শিক্ষক সৈবুর রহমান সাহেব। আমার প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা শুরু হয় লালগোলা রহমাতুল্লাহ হাই মাদ্রাসায়। গত শতকের পাঁচের দশকের কথা। তখন এই মাদ্রাসার কোন চালচুলো ছিল না। মাস্টারমশাইদের মাইনে পত্তরে কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। ছাত্রদের দেয় ট্যুইশন ফি আদায় হলে তা ভাগ করে দেওয়া হত। স্যাররা প্রথম পিরিয়ডে রসিদ বই নিয়ে ক্লাসে যেতেন। কেউ মাইনে আনলে তা আদায় করে, ক্লাস শুরু করতেন। এমন অবস্থায়, স্যাররা অন্যত্র সুযোগ পেলেই চলে যেতেন। তখন হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি থাকা আবশ্যক ছিল। আর এই যোগ্যতা নিয়ে কেউই এই অনিশ্চিত মাইনের পদে আসতে চাইতেন না। যদি বা আসতেন অন্যত্র সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন। এই পরিস্থিতিতে কোনও রকমে দিনাতিপাত ছাড়া পরিকাঠামোগত বা শিক্ষায়তনিক উন্নয়নের হাল ধরার কেউ ছিলেন না।

এমনই অবস্থায় মাদ্রাসার পরিকল্পক-প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবের প্রাক্তন ছাত্র সৈবুর সাহেব এসে হাল ধরলেন ১৯৫৬ সালের ১লা আগস্ট, এবং অফুরান প্রাণশক্তি নিয়ে কর্মযজ্ঞে নেমে পড়লেন। কয়েকজন শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে লালগোলা থানা এলাকার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চষে বেড়াতে লাগলেন।

স্কুল চলাকালে শিক্ষার উন্নয়ন, কখনও বা সরকারি দপ্তরে ধর্না—নানা প্রয়োজনে। আর বাকি সময়ে অভিভাবক, সুহৃদদের কাছে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য দরবার। দরবার ছাত্র সংগ্রহের জন্য। শিক্ষক ঘাটতির ফলে কোনও ক্লাস যাতে ফাঁকা না যায় সেদিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। তৎকালে হাই মাদ্রাসায়



দুটো পাবলিক এগ্‌জাম হত : হাই মাদ্রাসা এবং জুনিয়র মাদ্রাসা। জুনিয়র মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। অপেক্ষাকৃত উচ্চ মেধার ছাত্রদের এই পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হত। এই পরীক্ষায় ভাল ফল বিদ্যালয়ের শীর্ষে নতুন পালক যোগ করবে এই প্রত্যাশায় স্যার জুনিয়র মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষায় যোগ দেওয়াতেন। আমাদের বছরে পাঁচ জন ছাত্র এবং একজন ছাত্রীকে এই পরীক্ষার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। এই দুই পরীক্ষাতে ছাত্ররা যাতে ভাল ফল করে সেদিকে ছিল তাঁর নিবিড় অভিনিবেশ। পরীক্ষার তিন মাস আগে থেকে রীতিমত কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করতেন স্যার, এবং সেটা অবশ্যই বিনা পারিশ্রমিকে। রাত্রিবেলা ক্লাস নেওয়ার জন্য শিক্ষক-কক্ষের এক কোণে বিছানাপত্র আনিয়ে রাত্রিবাস করতেন। মাইল দুয়েক দূরবর্তী বাড়ি থেকে তাঁর জন্য খাবার আসত। ছাত্রদের জন্যও একই ব্যবস্থা। কোনো ছাত্রের বাড়ি থেকে খাবার আসতে কোনো কারণে বিঘ্ন হলে তাঁর খাবার থেকে ভাগ করে 'সাথে অন্ন-পান'।

তাঁর ছিল কঠোর অনুশাসন ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা। তা যেমন শ্রেণিকক্ষের ক্ষেত্রে, তেমনই মাদ্রাসার ইসলামী ঐতিহ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রেও। একটি বিষয় আজও মনে পড়ে—মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে জোহরের নামাজের সময় ছাত্রদের হাজিরা খাতা নিয়ে আসতেন, এবং গরহাজিরদের শাস্তিবিধান করতেন। প্রায়শই তা ছিল টিফিনের পরের সময়টা নীল ডাউন হয়ে থাকা।

আজ এই বিদ্যালয়ের ঝাঁ চকচকে সুরম্য ভবন, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার বিদগ্ধ শিক্ষকদের সমাবেশ, অগণিত ছাত্র-ছাত্রীর মিলনক্ষেত্র দেখে স্যারের কথা বেশি করে মনে পড়ে।

অন্য এক মহান শিক্ষকের স্মারক শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে আমার এই শিক্ষককে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। তাঁর পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করি।

**লেখক পরিচিতি**—*জন্ম ১৯৪৬ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার এক গণ্ডগ্রামে। লালগোলা রহমাতুল্লাহ হাই মাদ্রাসা ও এম এন একাডেমিতে পড়াশোনা করার পর বহরমপুর কে এন কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ, পি এইচ ডি, এবং আইনে স্নাতক। কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ ও মুর্শিদাবাদের ঔরঙ্গাবাদ কলেজে অধ্যাপনা। ইসলামপুর আদর্শ মহাবিদ্যালয় ও রানী কন্যাকুমারী মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করার পর অবসর গ্রহণ।*

# আমার প্রিয় শিক্ষক

## ড. অমলেন্দু বসু

প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্ররা তাদের জীবনের বুঝকে শিখতে শেখে ও যে কোনো পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার সাহসিকতা ও আত্মনির্ভরতা অর্জন করে। ছোটবেলা থেকে বাড়িতে এই শিক্ষা আমরা পাই বাবা-মা ও গুরুজনদের কাছে, আর স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে এই শিক্ষা দেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা। শিক্ষক দিবসে আমরা তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এই রকম এক বিশেষ দিনে আমি আমার প্রিয় শিক্ষককে নিয়ে স্মৃতিচারণা করার সুযোগ পাওয়াতে নিজে ধন্য মনে করছি আর অনুসন্ধানের এই সুন্দর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

ছোটবেলার স্কুল শিক্ষা দিয়ে আমার প্রথাগত শিক্ষা শুরু—যেমন সবারই হয়ে থাকে। অনেক শিক্ষক ও শিক্ষিকার সাহচর্যের মধ্য দিয়ে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট করা সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই। এতসব শিক্ষিক শিক্ষিকার মধ্যে আমার জীবনে চলার পথে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন আমার প্রিয় শিক্ষক প্রয়াত ড. আশীষ নাগচৌধুরী—যিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর প্রেরণা, তাঁর স্নেহ, তাঁর ভালোবাসা আর তাঁর শিক্ষা—যা আমার জীবনে চলার পথে সবসময় পাথেয় হয়ে ছিল, আছে ও থাকবে।

ড. আশীষ নাগচৌধুরী অনেক বড় মাপের মানুষ ছিলেন। তিনি জানতেন জীবনে যুদ্ধ করে কীভাবে এগিয়ে যেতে হয়, এবং ছাত্র হিসাবে আমাদেরও সবসময় সেই দিশাই দেখাতেন, যাতে কখনও মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ি—যাতে মনে বল নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি যতই কঠিন হোক সেই পথ। তিন ছিলেন 'ইয়ং সায়েনটিস্ট' সম্মানে ভূষিত এক স্বনামধন্য বিজ্ঞানী এবং যাদবপুর



বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি' বিভাগের প্রফেসর। বহু জার্নালের এডিটর বা কো-এডিটর, দেশ ও বিদেশখ্যাত তাঁর বিজ্ঞানচর্চা, এহেন বিজ্ঞানীর কাছে গবেষণা করার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। এই সময়ের স্মরণীয় ঘটনা হল গবেষণার প্রথম ধাপেই আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল হতে থাকে অন্যরকম, অর্থাৎ হাতে-কলমে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পাই আমার যৌগটা রক্তের সুগার কমানোর পরিবর্তে বাড়িয়ে দিচ্ছে। খুব ঘাবড়ে গেলাম।—ভাবলাম, সুগার বেড়ে গেলে এই যৌগ দিয়ে তো কোন উপকার হবে না। ভয়ে ভয়ে আমি ড. নাগচৌধুরীকে বলেছিলাম আর উনি শুনে খুশি হয়ে আমায় বললেন—এটাই সততা Very good. উনি আসলে আমাকে যে যৌগটা দিয়েছিলেন সেইটা একটা ফলের (জাম) বীজের extract. এর পাঁচটা ভাগের একটা অংশ—যার তিনটে অংশে রক্তের সুগার কমিয়েছিল আর দুটো অংশে সুগার বাড়িয়েছিল। তাই উনি আমার ফলাফলে খুশি হয়েছিলেন আর বলেছিলেন, এর নামই গবেষণা। কারণ পুরো জামের বীজের রক্তের সুগার কমানোর খানিকটা ক্ষমতা আছে কিন্তু এই গবেষণার মাধ্যমে বোঝা গেল যে দুটি অংশ সুগার বাড়াচ্ছে। সেগুলি বাদ দিলে বাকি তিনটি অংশে রক্তের সুগার কমানোর ক্ষমতা পুরো জামের বীজের চেয়েও অনেক বেশি। এইটাই তোমার এই গবেষণার পজিটিভ দিক। সেই সঙ্গে বলেছিলেন যে জীবনে কোনো জিনিস মনের মত না হলেই দুঃখ পেয়ো Negative finding হওয়াটাও তো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটা জানা গেল যে যৌগটা এটা করে না। তাঁর এই কথা আজও আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাই আজও ওনার কথার সূত্রেই এটা মনে হয় যে এই অতিমারীর মধ্যেও অনেক কিছুই শেখার আছে আমরা প্রতিনিয়ত সেই শিক্ষা নিয়েই এগিয়ে চলেছি। 'না'-এর মধ্যেও 'হ্যাঁ' লুকিয়ে আছে।—নতুন দিশায় অলোকপাত করার আশায় শুধু এগিয়ে যেতে হবে মনে দৃঢ়তা বজায় রেখে।

**লেখক পরিচিতি**—*প্রাক্তন অধিকর্তা, কারিগরি বিদ্যা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।*

# আমার শিক্ষক ড. যোগব্রত রায়

## পদ্মশ্রী ড. বিমল রায়

স্কুলের পর্ব চুকিয়ে কলেজে প্রবেশ করেছি। ভর্তি হয়েছি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে। বি. স্ট্যাট ক্লাসের প্রথম দিন, প্রথম পিরিয়ড। ক্লাসে ঢুকলেন এক রাশভারি অধ্যাপক। নাম শ্রীযোগব্রত রায়। ওনার পোশাকও ছিল খুব ফর্মাল। উনি ক্লাসে ঢুকে প্রথমেই সকলের নাম ও স্কুলের নাম জানলেন। তারপরেই জানালেন যে এই ইনস্টিটিউট একটু অন্য ধরনের। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর আস্থা রাখা হয় এবং কোন হাজিরা নেওয়া হয় না। এতে চার রকমের সম্ভাবনা দাঁড়ায়।

১. নিয়মিত ক্লাস করা ও ভালো রেজাল্ট করা।
২. নিয়মিত ক্লাস করা, কিন্তু আশানুরূপ রেজাল্ট না করা।
৩. অনিয়মিত ক্লাস করা ও খারাপ রেজাল্ট করা।
৪. অনিয়মিত ক্লাস করা, কিন্তু রেজাল্ট ভালো করা।

প্রথম সম্ভাবনা খুবই ভালো। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে এটি শিক্ষকের দায় এবং অধ্যাপক রায় নিজে দায়িত্ব নিয়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীকে আলাদাভাবে ক্লাসের বাইরে সময় দেবেন (সেটি উনি সর্বদা করেছেন)। তৃতীয়টির ক্ষেত্রে উনি সেই ছাত্র/ছাত্রীটির সাথে কোন সম্পর্কই রাখতে চান না। চতুর্থটির ক্ষেত্রে উনি যা বললেন তাতে আমি ও আমরা সকলে একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম—'আমি হতভাগ্য শিক্ষক। তোমাকে কিছুই দিতে পারলাম না।' এ রকম একটি গভীর কথা যা আজও



আমাকে নাড়া দেয় এবং আমিও আমার ছাত্র/ছাত্রীদের বলি।

ওনার শিক্ষাদানের পদ্ধতিটিও ছিল বড় অদ্ভুত। উনি যদিও সবই পড়াতেন অঙ্ক ঘেঁষা বিষয়, তবুও বোর্ডে অত্যন্ত কম লিখতেন। একটি বিষয় পড়ানো শুরু করলে তার উদ্দেশ্য, উপযোগিতা এবং বাস্তবজীবনে সম্ভাব্য প্রয়োগ নিয়ে বলতেন। কি কি ধরনের অঙ্কের রেজাল্ট সেখানে ব্যবহার হয়েছে, সেগুলির ইঙ্গিত দিতেন এবং তারপরে বলতেন বই থেকে এর ডিটেল পড়ে নিতে। পরবর্তী ক্লাসে উনি প্রায়শ সেগুলি ধরতেন। ওনার মূল কথা: 'বইতে যা লেখা আছে তা আর একবার করে উগরে দেওয়া আমার কাজ নয়, আমার কাজ হল তোমাদেরকে বই পড়তে উৎসাহ দেওয়া এবং যাতে তা পড়ে নিজেরাই সব বুঝতে পারো, তার জন্য যোগ্য ও উৎসাহিত করা।' এ এক গভীর জীবনদর্শন যা আমি সম্যক উপলব্ধি করেছি এবং আমার শিক্ষক জীবনে সর্বদা প্রয়োগ করার চেষ্টা করে চলেছি।

তবে একটা না বললেই নয়। আমার স্কুলজীবন গবেষণার জীবন পর্যন্ত অনেক শিক্ষক আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন, শিক্ষিত করেছেন এবং আমি এখন যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি তার পিছনে অবদান রেখেছেন। এনাদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নেওয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজ। আমি এই শিক্ষক দিবসে অধ্যাপক শ্রীযোগব্রত রায় সহ সকলকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

**লেখক পরিচিতি**—*কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক। পড়াশোনা নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং কানাডার ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াটারলু-তে। অধ্যাপনা তাঁর পেশা ও নেশা, এবং এই সুবাদেই ভারত সরকারের কাছ থেকে গৌরবজনক 'পদ্মশ্রী' পুরস্কার প্রাপ্তি।*

# আমার শিক্ষক

## পূর্ণেন্দু বসু

'আমার শিক্ষক' নিয়ে লিখতে গেলে একটা আস্ত বই হয়ে যাবে। কাকে ছেড়ে কাকে নিয়ে লিখব! তবে আমার শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে যাঁর স্থান সর্বাগ্রে, তিনি হলেন সাহানগর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক মদনমোহন রায়। টালিগঞ্জ রোডের ৬৫ পল্লীর কাছে ১৯৩১ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রামের হরিবাবুর প্রাইমারি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে ১৯৫৯ সালে কলকাতা চলে আসা। এরপর পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও স্বীকৃত স্কুলে না পড়ে সাহানগর বিদ্যালয়ে একেবারে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে যাই। সালটা ছিল ১৯৬৩। মদনবাবু স্যার তখনও প্রধান শিক্ষক হননি। কিছুকাল পরেই তিনি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে স্কুলটিকে ক্রমশ উৎকর্ষে পৌঁছে দেন। তাঁর একটি পা হাঁটু পর্যন্ত কাটা ছিল। তাতেও তিনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন বেশ গুছিয়ে। ক্র্যাচে ভর দিয়ে চলতেন। কিন্তু কোনও জড়তা দেখিনি কোনোদিন।

মদনবাবুর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—যে কোনো বিষয়ে পড়ানোর বিশেষ দক্ষতা। তাঁর ক্লাসে বাংলা থেকে পদার্থবিদ্যা, ভূগোল থেকে ইতিহাস-সংস্কৃত-সমাজবিদ্যা কী পড়িনি। তিনি যখন পড়াতেন প্রকৃত অর্থেই মোহাবিষ্ট থাকতাম। তাঁর কাছে বাংলায় লেখা এবং বাংলা ব্যাকরণ যেভাবে শিখেছি, তা আজও মনে আছে। তাঁর কাছেই প্রবন্ধ লেখার হাতেখড়ি। তাঁর শেখানো কারক-বিভক্তি নির্ণয় আজও ভুলিনি। তিনি যা শেখাতেন, মনে গেঁথে যেত। পড়ার আগ্রহ বাড়ত সমান তালে। শিক্ষা যে শুধু শ্রেণিকক্ষে আবদ্ধ থাকে না, তিনিই তা শিখিয়েছেন আমাদের। সমাজশিক্ষাও পেয়েছি তাঁর কাছে সমানে।

একটু উঁচু ক্লাসে ওঠার পর যে শিক্ষকমণ্ডলী পেয়েছি তাঁদের অনেকেই আমাদের বিপ্লবী বামপন্থী ভাবাদর্শের ভিত তৈরি করে দিয়েছেন। এর পিছনে মদনবাবুর যথেষ্টই প্রশ্রয় ছিল। ক্লাস এইটে উঠেই মিটিং-মিছিলে যাতায়াত শুরু হয়ে যায়। নেমে পড়ি ছাত্র-ধর্মঘটে।



দুটি বিষয় উল্লেখ করে শেষ করব। এক, আমি শিক্ষা বানান লিখতাম 'শিক্ষ্যা' এবং ভুল বানান লিখতাম 'ভূল'। এটা বুঝতে পেরে একদিন মদনবাবু আমাকে তাঁর ঘরে ডাকলেন। একটা দু'নম্বর খাতা নিয়ে লিখলেন — আমি আজ থেকে 'শিক্ষ্যা' না লিখে শিক্ষা এবং 'ভূল' না লিখে 'ভুল' লিখব। এরপর বললেন, গোটা খাতা ভরে এই বাক্যটা লিখে কালকে আমাকে দেখাবি। এরপর আর ভুল হয়নি।

তখন দশম শ্রেণিতে পড়ি। কয়েকজন মিলে একটা দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করলাম। নাম 'হিন্দোলন'। মদনবাবু যে কী খুশি হয়েছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। ওই পত্রিকায় ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়ানো একটা ছবির মাধ্যমে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। খুব সুন্দর ছবিটা এঁকেছিল দিলীপ। মদনবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেওয়াল পত্রিকার পুরোটা পড়েন। মনে আছে আমাকে ডেকে বলেছিলেন, 'তোর প্রবন্ধ—গল্প ও রম্যরচনা মিশ্রিত 'প্রতিচ্ছবি' লেখাটা খুব ভাল হয়েছে। আসলে ওটা একটা গল্প। তাই না?' বলেছিলাম, স্যার, আপনার কাছে যা শিখেছি তা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি লেখাটায়। এই হলেন মদনবাবু।

খুব কম বেতন পেতেন সেই সময়ের শিক্ষকেরা। কিন্তু দিতেন নিজেদের উজাড় করে। সেই শিক্ষকরা আজ কোথায়? দু-পাঁচজন নিশ্চয়ই আছেন। তবে যা ছিল তার অনেকটাই আর নেই।

মনে পড়ে আশিসবাবুর কথা। তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। আমরা টানা তিন-সাড়ে তিন মাস স্কুল-ধর্মঘট করে আশিসবাবুকে ফিরিয়ে এনেছিলাম। মদনবাবুর প্রশ্রয় ছিল আমাদের প্রতি। সেই প্রথম আন্দোলনের হাতেখড়ি। ৭০-এ এসে আজও যার বিরাম নেই। মদনবাবুরা ব্যতিক্রম। তাঁকে ও আমার অন্যান্য শিক্ষকদের সকলকে শতকোটি প্রণাম।

**লেখক পরিচিতি**—*প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী ও কারিগরি শিক্ষা মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত। রাজনৈতিক কারণে কারাবরণও করতে হয়। রাজনীতি নিয়ে লেখালেখির চর্চা আছে। কৃষকদের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ। কৃষিকাজে খরচ কমানো, কৃষকদের আয় বাড়ানো, জৈব পদ্ধতিতে কৃষিকার্য নিয়ে তাঁর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা সুবিদিত।*

# প্রিয় শিক্ষক

## ড. বাসব চৌধুরী

শিক্ষক দিবস আসছে। ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন। দিনটির একটি বিশিষ্টতা আছে। ওনার ছাত্ররা একবার ওনার জন্মদিন পালন করতে চেয়েছিলেন। রাধাকৃষ্ণণ তখন দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করার প্রস্তাব দেন। সেই থেকে এই শিক্ষক দিবস পালনের প্রথা চলে আসছে।

আমার প্রিয় শিক্ষক কে, এই প্রশ্নটা আমাকে খুব ভাবায়। কেউ একজন আছেন কি যিনিই শ্রেষ্ঠ! না কি শিক্ষাজীবনে যাঁদের সঙ্গে দেখা হয় বা হয়েছে, তাঁদের অনেকেই জীবনে দাগ কেটে যান। অনেক দাগ বা রেখার মধ্যে দিয়ে চিত্র অঙ্কিত হয়। তেমনই অনেকের সম্মিলিত প্রয়াস আমার আমি-কে আমি যেমন, তেমন হতে সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, একজন মানুষ বহু মানুষের সাথে যুক্ত, বহু মানুষের হাতে তৈরি। এইসব মানুষ সকলেই আমার শিক্ষক। এঁদের মধ্য থেকে একজনকে খুঁজে বার করা আমার পক্ষে বড় শক্ত কাজ। তা ছাড়া, কোনো একজন মানুষের মধ্যে মানুষ গড়বার সব গুণ থাকবে, এটা খানিকটা অবাস্তব চাওয়া। অনেক আলোকে ধৌত হতে হতে তবে আমার এই আমি হওয়া। এখনো কত অপূর্ণতা আমার মধ্যে, ভাবনার মধ্যে, সে কথাগুলোও আসে তো!

যে কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হল প্রকৃতি। আমারও তাই। প্রকৃতির রূপ রস বর্ণ গন্ধ সৌন্দর্য এবং বার বার পরিবর্তিত হওয়া, আর ফিরে আসা নব নব রূপে, এ শিক্ষা আর কে দিতে পারবে? অনন্ত অসীমের মধ্যে বাস করে মানুষ। কিন্তু প্রায়ই ভুলে যায় তার সৌভাগ্যের কথা। তাই সে জীবনের



পরিপূর্ণ রস গ্রহণ করতে পারে না। জীবনের ওঠা পড়ায় তার দুঃখ হয়। কিন্তু প্রকৃতি মানুষকে বার বার শেখায়, জীবন থেকে জীবনে ফিরে আসার কথা। আকাশের কথা ভাবুন। সকাল বেলায় নীল। হঠাৎ কালো হয়ে গিয়ে দারুণ বৃষ্টি নামলো। বিদ্যুৎ চমকালো। মাঠে কাজ করা কয়েকজনের মৃত্যুও হল বজ্রপাতে। তারপর বিকেলবেলা আকাশ আবার নীল। সেই নীলে সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায় কাশফুলের মতন। তার একটু পরে আকাশের রঙ গৈরিক। লাল আলো ছড়িয়ে পড়ে মাথায় গায়ে এবং সবুজ ঘাসে। তারপর সন্ধ্যা নামে। আকাশে তারা দেখা যায়। এই সব দেখলে এবং আত্মস্থ করলেই তো শিক্ষা হয়ে যায়। তাই না!

বিজ্ঞান! তাও আছে। ওই যে ভ্রমরের গুনগুন, ফুলে ফুলে বসা, পরাগ সংযোগ, এবং তারপর ফল হয়ে ওঠা। অথবা, সূর্যালোক সবুজ পাতার গা ধুইয়ে দিয়ে যাচ্ছে, প্রকৃতি পাঠ দিচ্ছে সালোক সংশ্লেষের। কিংবা অনেক উঁচু থেকে জল পড়ছে, আর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। এই সব ঠিকঠাক পড়তে পারলে শিক্ষা হয়ে যায় আপনা-আপনি। সে শিক্ষা রোজগারের নয়, আনন্দের। আমার অনুভবে সেই শিক্ষাই আসল যা মনকে আনন্দে ভরে তোলে।

তাই প্রকৃতিই আমার প্রিয় শিক্ষক। কখনো কোমল, পেলব, কখনো কঠিন, উদাসীন। এই সব নিয়েই আমি প্রকৃতির কাছে রোজ যাই। প্রণিপাত করি। কখনো হাসি। কখনো কাঁদি। এইসব নিয়ে বাঁচি। আনন্দে ও উদ্দীপনায়।

**লেখক পরিচিতি**—*কল্যাণ ভারতী ট্রাস্টের সিনিয়র ডিরেক্টর, শিক্ষা, এবং হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যক্ষ। এর আগে তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।*

# আচার্য কথা

## ড. নিখিল কুমার সিনহা

শিক্ষা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'শাস্' ধাতু থেকে। যার অর্থ হল শাসন করা, শৃঙ্খলিত করা, নিয়ন্ত্রিত করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া বা নির্দেশনা দেওয়া। এই কাজগুলিকে যিনি এগিয়ে নিয়ে যান তিনিই তো শিক্ষক। গুরু, আচার্য, বন্ধু-জীবনদার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক, উত্তরণের আলোকবর্তিকা—বিভিন্নভাবে বর্ণিত হন একজন শিক্ষক। ছাত্রজীবনের বিভিন্ন স্তরে বহু শিক্ষকের সান্নিধ্যে এসেছি। তাঁরা সকলেই শ্রদ্ধেয়। তবুও নিজের অজান্তেই কেউ কেউ তাঁর নিজ চরিত্রগুণে হয়ে উঠেছেন পরম প্রিয়। আজ সেইরকম একজন শিক্ষকের কথাই বলব।

১৯৮২ সালের আগস্ট মাস। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এস সি পাশ করে বিশ্বভারতীতে এম এস সি পড়ার জন্য অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে গেছি। গাঢ় হলুদ রংয়ের শার্ট পরা এক ভদ্রলোক কল লেটার ও মার্কসশিট দেখে অ্যাডমিট ইস্যু করলেন। ভাবলাম কোনো অফিস স্টাফ। মেরিট লিস্টে প্রথমেই নামটি ছিল। অ্যাডমিশন নিলাম, ক্লাস শুরু হল। বটানি ডিপার্টমেন্টের উঠোনে বন্ধুদের সাথে দাঁড়িয়ে আছি। সেই ভদ্রলোক পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে ক্লাসের খবরাখবর নিলেন। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'Are you Sinha?' তখনই বন্ধুদের কাছে জানলাম উনি অধ্যাপক স্বপনকুমার দত্ত (শান্তিনিকেতনে স্বপনদা)। এম এস সি দ্বিতীয় বর্ষে উনি যে স্পেশাল পেপারটা পড়াতেন সেটাই নিলাম আমরা তিনজন। খুব কাছাকাছি আসার সুযোগ হল। থিয়োরি ক্লাস হত সন্ধেয় ওনার চেম্বারে চেয়ার-টেবিলে। ক্লাসের মাঝেই



আসত চা, কোনো কোনোদিন টিফিন। বাড়িতে কোনো কারণে গেলে অবশ্যই কিছু খাওয়াতেন। এমনও হয়েছে—আমরা গেছি স্বপনদার বাড়িতে। ফেরার সময় উনি আমাদেরকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছেন। সেইসময় ফেরিওয়ালা মিষ্টি বিক্রি করতে এসেছে। মিষ্টি কিনে বাচ্চাদের মতো আমাদের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

এক পুজোর ছুটিতে শান্তিনিকেতনে স্বপনদার বাড়িতে গেলাম। দেখলাম এক সিনিয়র দাদার থিসিস প্রস্তুতির কাজ চলছে। আমাকে বললেন, পি এইচ ডি-টা করে নাও। ইতিমধ্যে আমি স্কুলে শিক্ষকতায় জয়েন করেছি। আমি একটু ইতস্তত করতেই উনি বললেন, পার্টটাইমে করে নাও, তবে খাটতে হবে বেশি, সময় একই লাগবে। তাঁর উৎসাহেই অবশেষে আমার পি এইচ ডি হল।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস সি ও পি এইচ ডি করার পর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টিনারি কলেজ ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এরপর ফেলোশিপ নিয়ে চলে যান জার্মানির জুরিখে। এরপর বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানী ও অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। প্রায় দু'দশক পর ফিরে এসে যোগ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল (ICAR) ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদ। বর্তমানে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৃষি বিজ্ঞানীদের তালিকায় জীব-প্রযুক্তিবিদ হিসাবে তাঁর বিশেষ পরিচিতি। ম্যানিলায় গবেষণাকালে ভারতীয় ধানের মধ্যে বিটা-ক্যারোটিন উৎপাদনকারী জিন প্রবেশ করিয়ে ট্রান্সজেনিক রাইস (গোল্ডেন রাইস) উৎপাদন করেন। এই চালের ভাত খেলে ভিটামিন 'এ'-র চাহিদা অনেকটাই পূরণ হয়।

স্নেহপরায়ণ, কর্তব্যপরায়ণ, কঠোর পরিশ্রমী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতি, ছাত্রের মতো অনুসন্ধিৎসু, হার্দিক প্রশাসক যদি একজন আদর্শ শিক্ষকের মাঠকাঠি হয় তবে তিনিই আমার আদর্শ শিক্ষক।

**লেখক পরিচিতি**—*সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতক। স্নাতকোত্তর ও পি এইচ ডি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। রামপুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত। শিক্ষকতায় অবদানের জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার সহ অন্যান্য পুরস্কারে ভূষিত।*

# পিতৃদেব : আমার প্রথম শিক্ষক

## দিব্যগোপাল ঘটক

আমার পিতৃদেব আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে রূপনারায়ণের তীর ধরে তাঁর সঙ্গে বিদ্যালয়ে আসার সময় প্রতিদিন দেখতাম সারাটা রাস্তা ধরে সাধারণ মানুষ কেমন করে মানুষটিকে 'নমস্কার মাস্টারমশাই' সম্বোধনে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। হয়তো এটাই ছিল আমার নিজের 'আত্মসম্মান' বোধের প্রথম হাতেখড়ি। 'বাঁচতে হলে ঘাড় উঁচু করে বাঁচো; সহজে আত্মসম্মান বিসর্জন দিও না'—এই শিক্ষা উনি আমার মধ্যে নীরবে বপন করে দিয়েছেন সেদিন।

বিদ্যালয়ের পাঠ তো আর শুধু শোনা, মুখস্থ করা আর পরীক্ষায় তা উদ্‌গীরণ করা নয়। সব কৃত্যালির পশ্চাতে রয়েছে কোনো না কোনো শিখন-খণ্ড। সেটাই হলো শিক্ষার আসল তত্ত্ব। সেদিন ছিল দেবব্রতবাবুর বিদায় সম্বর্ধনা। ভূগোলের শিক্ষক অধ্যাপক হয়ে বিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন। পিতৃদেব তখন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপর। আমরা কচি-কাঁচারা দর্শকের দলে বসে কলকল করছি। কারও থাকা বা যাওয়া নিয়ে আমাদের কারোরই তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না। একে একে সবাই বলে যাচ্ছেন। পিতৃদেব সবার শেষে উঠলেন। কোঁচা ঝোলানো সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত লম্বা দোহারা চেহারার এই মাস্টারমশাই বলতে শুরু করতেই সবাই চুপ। হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসছিল তাঁর কথাগুলো। শিক্ষক দেবব্রতবাবুর এত সহজ ও আন্তরিক মূল্যায়ন সেদিনের খুদে শ্রোতারাও যেন বুঝতে পারছিল। রবিঠাকুরের ছোটদের একটা কবিতা হঠাৎই আমার পিতৃদেব আবৃত্তি করতে শুরু করলেন।

'কতদিন ভাবে ফুল  উড়ে যাব কবে,



যেথা খুশি সেথা যাব  ভারি মজা হবে।
তাই ফুল একদিন,  মেলি দিল ডানা—
প্রজাপতি হ'ল, তারে  কে করিবে মানা।'

কবিতাটি আওড়াতে আওড়াতে পিতৃদেব অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। তখন আমাদের সবার চোখেই জল। প্রিয় শিক্ষক দেবব্রতবাবুকে আর আমরা দেখতে পাব না—এই ব্যথাবোধ আমাদের মধ্যে চরকির মত ছড়িয়ে পড়ল। অন্যের জন্যে ব্যথাবোধের এমন সহজ পাঠ আমার শিক্ষক—পিতৃদেবের কাছেই শেখা।

প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে শেখানো আর চেনা পরিবেশের প্রতি শিশুর গভীর মমত্ববোধ জাগানোর কাজটিও আমার পিতৃদেব খুব সহজে করতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি'র সঙ্গে আমাদের সবার পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে। দ্রুতপঠনের জন্য নির্বাচিত সংক্ষিপ্ত একটি পাঠ্যাংশকে এমনভাবে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসটির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন যে আমরা সবাই স্কুলের লাইব্রেরি থেকে 'পথের পাঁচালি'র সংক্ষেপিত সংস্করণটি তোলার জন্য হুড়োহুড়ি করেছিলাম। ছুটির দিন দুপুরে পিতৃদেব দড়ির দোলায় দুলতেন আর আমি সরবে 'পথের পাঁচালি' পাঠ করতাম। জল-জঙ্গল-নদী-ঝোপ-কাশবন-দুর্গাপূজা-দারিদ্র্য-বর্ষার নিদারুণ অভিজ্ঞতা আমার দেখা-চেনা পরিবেশের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যেত। 'পথের পাঁচালি'র চোখ দিয়ে নিজের গ্রাম—তার সুখ-দুঃখ-সম্পর্ক সবকিছুকে আরও গভীরভাবে অনুভব করতে পারতাম। এভাবেই নিজের এলাকা আর গ্রামকে ভালবাসতে শিখেছিলাম। অপু যখন ছিন্নমূল হয়ে শহরের দিকে পাড়ি দিচ্ছে, সেই কাহিনি পড়তে পড়তে আমি তখন নিজেই বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় ভেঙে পড়তাম। চোখ ভরে আসত জলে। ঝাপসা হয়ে আসত লেখা। চোখ মুছে পিতৃদেবের দিকে তাকাতাম। দেখতাম আমার প্রথম শিক্ষকেরও অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে আধপাকা বুকের উপর দিয়ে।

**লেখক পরিচিতি**—*অবসরপ্রাপ্ত উপশিক্ষা অধিকর্তা। দীর্ঘদিন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ও ডি পি ই পি-তে ডেপুটি স্টেট প্রজেক্ট ডিরেক্টর ছিলেন। শিক্ষার নতুন ধারা নিয়ে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রয়োগ পদ্ধতির উদ্ভাবন, মডিউল তৈরি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, আধুনিক শ্রেণিকক্ষের মডেল নির্মাণ, নিবন্ধ রচনা—এইসব কাজে সবিশেষ আগ্রহ ও পারদর্শিতা।*

# রুবিন স্যার

## ড. মতিয়ার রহমান খান

ছাত্রজীবনে স্কুল থেকে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়—বিভিন্ন স্তরে অনেক জ্ঞানী-গুণী শিক্ষক মহাশয়ের সান্নিধ্য পেয়েছি এবং তাঁদের জ্ঞান ও দর্শন আমাকে আকৃষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে। সকলকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করি এবং সকলের আলাদা-আলাদা চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, আদেশ ও উপদেশ আমার জীবনের কঠিন ধাপগুলো পেরোতে সাহায্য করেছে। তবে 'আমার প্রিয় শিক্ষক' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে যে হাসি-খুশি ও স্নেহভরা মুখটি মনে পড়ে—তিনি হলেন রুবিন স্যার (আব্দুল হামিদ, জন্ম : ১৯৫২, মৃত্যু : ২০১৮)। তিনি ছিলেন দাদপুর বাতাসপুর জুনিয়র স্কুলের শিক্ষক। সম্পর্কটা শুধুই ছাত্র-শিক্ষক ছিল না। উনি ছিলেন আমার এবং আমার দাদাদেরও প্রিয়। স্কুলে ইতিহাস ও গণিত ক্লাস নিতেন। ছাত্রদের প্রতি ছিল শাসন, আদর ও অফুরন্ত স্নেহ-ভালবাসা। সকল ছাত্র-ছাত্রীর চাল-চলন এবং গতি-প্রকৃতির প্রতি কড়া নজর রাখতেন ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেখ বুঝতে পারতেন তাদের পারিবারিক এবং আর্থিক অবস্থা। দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে ভাবতেন। গণিত, ইংরেজি, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়েও চর্চা করতেন এবং ছাত্রদের আলাদাভাবে বাড়িতে ডেকে পড়াতেন। আমি ওনার বাড়িতে পড়তে যেতাম। আরো কয়েকজন দুঃস্থ ছাত্রও পড়তে যেত। আমার গ্রাম (পানিসাইল, বীরভূম) থেকে ওনার বাড়ি (দাদপুর) প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে। প্রতিদিনই সকালে পায়ে হেঁটে মাঠ পেরিয়ে পড়তে যেতাম। গ্রীষ্মকালে



সকালে স্কুল হত, তাই দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে ওনার বাড়ি চলে যেতাম। পড়া না পারলে হাত-পাখার মার! রোববার দীর্ঘ সময় পড়াতেন। দশটা নাগাদ পাউরুটি টিফিন দিতেন, বারোটার আগে ছাড়তেন না। পড়ানোর জন্য উনি কোনোদিন টাকা চাইতেন না। স্কুল পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং চাকরি অবধি আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। উনি আমার এবং আমার দাদার (আইয়ুব অলী খান) কথা সকলকে বলতেন এবং অন্যান্য ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। আমাকে মাঝে মাঝে আমার বেতন জিজ্ঞেস করতেন আর নিজের বেতন নিয়ে গল্প শোনাতেন। ছুটিতে বাড়ি গেলে ওনার সঙ্গে দেখা করতাম এবং খুব গল্প করতেন। কখনো কখনো আমাদের খবর পেয়ে সাইকেলে করে চলে আসতেন এবং বাড়ির সকলের সঙ্গে আলাপ করে, কুশল জেনে খুব আনন্দ পেতেন। শেষ দেখা হয়েছিল ২০১৮ সালে। সপরিবার ওনার বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমার মেয়ে সুহানা সিমরান-কে একটা বই উপহার দিয়েছিলেন। শীতের সময় স্যারের একটু শারীরিক সমস্যা হত। কারণ ওনার একটা বড় অপারেশন হয়েছিল এবং শরীরে হাড়ের মধ্যে প্লেট বসানো ছিল। শুনে আমি ভেবেছিলাম ওনাকে একটা ফুল মাপের শীতের জ্যাকেট উপহার দেওয়ার কথা। কিনেছিলাম দিল্লির করোলবাগ থেকে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে দিল্লি থেকে বাড়ি যাওয়ার সময় ওনার জ্যাকেটটা সঙ্গে নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। খুব খারাপ লেগেছিল ওনাকে নিজের হাতে দিতে পারিনি সেইবার। দিল্লি ফিরে জ্যাকেটটা দাদার হাতে ওনার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। জ্যাকেট পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। অল্প কিছুদিন পরে ওনার মৃত্যুসংবাদ পাই। ছোট থেকে অনেক শিক্ষকের সান্নিধ্য পেয়েছি ও সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং চিরঋণী। তবে রুবিন স্যারের সান্নিধ্য এবং ওনার আদর্শ, অনুশাসন, উপদেশ ও অনুপ্রেরণা অবিস্মরণীয়।

**লেখক পরিচিতি**—*ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থান (ICAR)-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক ও বিভাগীয় অধ্যাপক। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক। মাস্টার্স ও পি এইচ ডি ICAR থেকে। কর্মজীবন শুরু বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্কুলশিক্ষার মানোন্নয়ন ও মেধার পরিচর্যার লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে চলেছেন।*

# আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক শচীনবাবু

## শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

গ্রাম থেকে এসে শহরের বিদ্যালয়, মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন (মেন)-এ ভর্তি হলাম একেবারে ক্লাস ফাইভ-এ।

প্রথম দিন দ্বিতীয় পিরিয়ডে বাঙলা, পড়াতে এলেন শচীনবাবু, শ্রী শচীন্দ্রনাথ গুহ। ইনিই সেই শিক্ষক যিনি সবদিক থেকে আমাদের অনেকের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবেন। প্রবল পূর্ববঙ্গীয় টানে কথা শুরু করলেন, খাস উত্তর কলকাতার অন্দরমহলে 'ঘটি'-অধ্যুষিত পরিবারগুলি থেকে আসা পড়ুয়াদের সঙ্গে।

শচীনবাবুর ক্ষেত্রে পরিচয়ের অভিনবত্ব আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল। দিনটা ছিল চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের নায়ক সূর্য সেন-এর ফাঁসির দিন। বলাই বাহুল্য, নয়-দশ বছরের বালকদের কাছে ব্যক্তি সূর্য সেন, তাঁর কাজ ও প্রাসঙ্গিকতা—এর কোনোটার সম্পর্কেই প্রায় কিছুমাত্র ধারণা ছিল না। ধীর স্বরে গল্প বলতে বলতে তিনি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা চট্টগ্রাম শহর, ডবল মুরিং জেটি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, অস্ত্রাগার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মানচিত্র ঝটপট বোর্ডে এঁকে ফেললেন। শুরু হলো স্বপ্নের নায়কদের নিয়ে একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। শচীনবাবু এই যুব বিদ্রোহের একজন অংশগ্রহণকারী ছিলেন। আমরা আজকে জানি, আগে থেকে অনুমান করতে না পারা বিভ্রাটের ফলে বিভিন্ন কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা। পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। বিদ্রোহীরা দু'বার শহরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন এবং সেই প্রচেষ্টায় শচীনবাবু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন ও অল্পের জন্য পুলিশের হাত এড়াতে সক্ষম হন। পরে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দেওয়া শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস সহ আরও কয়েকজনের সঙ্গে তিনি ধরা পড়েন। আইনজ্ঞরা কৌশল করে তাঁর মামলাটি 'জুভেনাইল আদালতে' বিচারের চেষ্টায় সফল হন এবং তাঁকে বরিশাল জেলে পাঠানো হয়। জেল থেকে পরীক্ষা দিয়ে তিনি প্রথম হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মশাইয়ের কাছে স্নাতকোত্তর পড়াশুনার দাবি জানালে বি এম কলেজের বাংলা



বিভাগকে স্নাতকোত্তর স্তরে উন্নীত করা হয় এবং তিনি জেল থেকে স্নাতকোত্তর স্তরেও প্রথম হন।

প্রমাণাভাবে তিনি ছাড়া পান এবং তৎকালীন বার্মায় সংগঠনের কাজে চলে যান। বার্মা থেকে যখন ভারতীয়, বিশেষত বাঙালি বিতাড়নের ঢেউ ওঠে, তখন তিনি, তাঁর মা ও পরিবারের অন্যান্যদের নিয়ে বার্মা সীমান্ত পেরিয়ে ব্রিটিশ ভারতে প্রবেশের মুখে দাঙ্গাবাজদের হাতে তাঁর পরিবারের সকলকে হারান ও সর্বস্বান্ত অবস্থায় কলকাতায় আসেন। কলেজের চাকরি জুটে যায়। কয়েক মাস সেই চাকরি করার পর তাঁর মনে পড়ে মাস্টারদা সূর্য সেনের সেই অমোঘ শিক্ষা—জাতি গঠনের জন্য শ্রেষ্ঠ মাল-মশলা লুকিয়ে রয়েছে বিদ্যালয়ের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের কৌতূহলী হৃদয়ের মর্মস্থলে। কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি যোগ দেন আমাদের স্কুলে। সেখান থেকেই অবসর নেন।

শচীনবাবু উঁচু ক্লাসে বাংলা কবিতা পড়াতেন আমাদের। কবিতা পড়ানোর আগে কবি সম্পর্কে, কবিতা রচনাকালের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা নিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করতেন। তারপর কবিতাটি পড়তেন, সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা, কেবল পঠনের মাধ্যমেই কবিতার নির্গলিতার্থ চমৎকারভাবে প্রতিফলিত করার বিরল প্রতিভা ছিল তাঁর। তিনি বছরে কেবল দুটি দিন শ্রেণির পড়া পড়াতেন না। দিনদুটি ছিল সূর্য সেন ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির দিন।

কয়েকশো প্রাক্তন ছাত্রকে তিনি নামে চিনতেন, জানার প্রবল উৎসাহ ছিল পরিণত বয়সে আমরা কে কোথায় কী কাজে নিয়োজিত। শচীনবাবুরা ছিলেন সেই ডাইনোসর যুগের মানুষ, যাঁরা নিজের জীবন ও কাজ দিয়ে আজকের এই পরিব্যাপ্ত পাটোয়ারি-বুদ্ধি শাসিত যুগে প্রবল দাপটে শুধু টিকে ছিলেন না, এক পুঞ্জীভূত প্রতিস্পর্ধার কেন্দ্রে থেকে স্বার্থ-বুদ্ধির দিকে অবধারিত শক্তিশেল নিক্ষেপ করে গেছেন ক্রমাগত, আজীবন, ক্লান্তিহীনভাবে।

**লেখক পরিচিতি**—*কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। বিজ্ঞান পঠন পাঠন, বিকল্প শিখনপদ্ধতি নিয়ে কাজ করেন। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা প্রচার ও প্রসারের কাজে যুক্ত।*

# ট্রাম্পেটওয়ালা

## ড. শুভময় দাস

আজকাল তেমন কেউ আর ট্রাম্পেট বাজান না। একটা সাদা কোট গায়ে ট্রাম্পেট নিয়ে নিয়ন আলোর তলা দিয়ে বাজিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন কোন এক ট্রাম্পেটওয়ালা...। তেমনটি আজও পাইনি। হয়তো আছেন আমার শহরে-গ্রামে। আমি হতভাগা। আমার জোটেনি তেমন কোনো হেমেলিনের বাঁশিওয়ালা কিংবা নিয়ন আলোর ট্রাম্পেটওয়ালা। তবে দূর থেকে সুর শুনে সুর তুলে সেই সুর ভাঙিয়ে আজও খেয়ে পরে বেঁচে আছি। সুরের আগুন কেউ না কেউ জাগিয়েছিলেন নিশ্চয়ই ...। নইলে ...। আজও তেমন কোন সুর পাইনি যে আমায় বলতে পারে, 'পাগল হয়ে বাজা'... 'বুঁদ হয়ে...' 'তুমিও পারবে...'! তাই জীবনে যা পাইনি এই আধবুড়ো বয়সে সেই সুরবিন্যাসের নেশায় আজও নিজেকে আচ্ছন্ন রাখি।

জীবনে 'স্যার' পেয়েছি অনেক কিন্তু 'মাস্টারমশাই' পেয়েছি হাতে গোনা। বয়স অনেক হলো। বানিয়ে বলবার প্রয়োজন আজ আর বোধ করি না। টিউটর-মাস্টারমশাইয়ে ফারাক অনেক। কেউ মাছ 'খাওয়ান' আর কেউ 'ধরতে শেখান'। অনেকে এক্ষেত্রে ভাগ্যবান। আমার ভাঁড়ার প্রায় শূন্য। গ্রামের অতি নিম্নমেধার ছাত্র ছিলাম। বাবা নোটবই আর টিউশনি পড়বার বিরোধী ছিলেন। কিছুটা জীবননীতি আর বাদবাকিটা অর্থনীতির কারণে—সেটা আজ বুঝি। 'কেজি থেকে পিজি'—টিউশন-টিচার ছুঁইনি কোনো দিন। চোখে পড়ার মতো রেজাল্টও করিনি। ভালবাসা চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিম্নমেধার দরিদ্র গাঁইয়ার কাছে আসার আগে শেষ হয়ে যেত অন্য জায়গায়। কিংবা হয়তো ভালবাসা বুঝবার গ্রাহক রিসেপ্টর ছিলো



না আমার। অনেককে স্টেজে পারফর্ম করতে দেখেছি, কিন্তু ওই যে—হেঁটে যাওয়া ট্রাম্পেটওয়ালা একটাও পাইনি আজও। খুঁজে নেবার মত মন বা ক্ষমতা ছিল না হয়তো।

কে যেন বলেছেন, 'গুরু মেলে লাখ—শিষ্য মেলে এক'। কোনোদিন প্রকৃত ছাত্র-শিষ্য হয়ে উঠতে পারিনি বলেই তেমন গুরু-শিক্ষক ভুরিভুরি পাইনি। ছাত্র হয়ে উঠতে পারলেই আমার পাতা ভরে উঠতো। প্রত্যেকেই শিক্ষক হয়ে উঠতে পারতেন। এ দোষ আমারই।

আবার শিক্ষক পাইনি বলিই বা কীভাবে? বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব বলেছিলেন, 'যন্ত্র হইলো পোলাপান। যন্ত্ররে তুমি যেইভাবে কোলে নিবা যন্ত্র ঠিক সেইভাবে কথা কইব'। আমার যন্ত্র—আমার গুরু—আমার শিক্ষক—আমার ছাত্রছাত্রীরাই। ওদেরই যে দেবতার মত শ্রদ্ধা ভক্তি করি! প্রতিদিন ভালোবেসে কাছে টানি, কোলে বসাই, আদর করি। শুধু জীবিকার জন্য ব্যবহার করলে যন্ত্র কথা বলে না। ওদের সঙ্গে রোজ রেওয়াজে বসি, ক্লান্ত হয়ে ওদেরই জড়িয়ে ওদেরই কোলে ঘুমিয়ে যাই, গভীর রাতে ওদের সঙ্গে কথা বলি। ওরাই আমার শিক্ষক-প্রেম-রাগরাগিনী-প্রেমের ভাষা। ওদের কখনো ভাবি বাবা-মা-প্রেমিকা-স্ত্রী-সন্তান। গভীর প্রেম না থাকলে বুঝেছি আমি যা বলতে চাইছি ওরা তা শুনবে না। আমার চোখ গলা আর শরীরী ভাষা আমার শিক্ষক-ছাত্রদের ভালবেসে শাসন করে—কাছে টানে। এটা আমার অন্তরাত্মার দ্বিতীয় সন্তান। 'শিক্ষক' হয়ে বুঝেছি কেন কোনো শিক্ষক পাইনি। কারণ, ছাত্র হয়ে উঠতে পারিনি আজও। হে প্রভু, শিক্ষক হতে চাইনে, আমায় ছাত্র হবার সুযোগ দাও। আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও প্রভু। আমায় ছাত্র করে দাও। ঠাঁই দাও ওঁদের চরণে।

**লেখক পরিচিতি**—*বিভাগীয় প্রধান, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ (বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়), মেদিনীপুর।*

# আমার শিক্ষক

## চঞ্চলকুমার ঘোষ

শিক্ষক কে? যিনি আমাদের শিক্ষা দেন। প্রথম শিক্ষক মা। তাঁর মুখের কথা শুনে আমার কথা বলতে শিখি। তাঁর হাত ধরেই শিখি বর্ণপরিচয়ের প্রথম পাঠ। শৈশব আসে। এবার চল বিদ্যালয়। জীবনের নতুন পাঠ শুরু হয়। সেই পাঠ দেন শিক্ষক। প্রকৃত অর্থে জীবনকে গড়ে দেন শিক্ষক।

জীবনের বেলাশেষে যখন পিছনে ফিরে চাই, স্মৃতি বিস্মৃতির মাঝে কত শিক্ষকের মুখ মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। সকলেই প্রণম্য। সকলের দানেই জীবন সমৃদ্ধ। তবু তারই মাঝে তিনজনের কথা বিশেষ মনে পড়ে। যদিও প্রত্যক্ষভাবে আমি তাঁদের সবার ছাত্র নই তবু মনে করি তাঁরা আমার চিরদিনের শিক্ষক।

প্রথম জনের নাম মনোজ চক্রবর্তী। দুর্গাপুরে যে স্কুলে পড়তাম তিনি ছিলেন সেই স্কুলের শিক্ষক। উনি যখন স্কুলে এলেন আমি সেই বছর কলেজে ভর্তি হলাম। একই পাড়ায় থাকতাম। লেখালেখির অভ্যাস ছিল। মাঝে মাঝে চলে যেতাম স্যারের ঘরে অপটু কাঁচা লেখা নিয়ে। কিন্তু কী যত্ন করে সংশোধন করে দিতেন। বৌদি মুড়ি মেখে নিয়ে আসতেন, মুড়ি তেলেভাজা খেতে খেতে স্যার বলতেন দেশ বিদেশের সাহিত্যের কথা। গ্রামের মানুষ। কথাবার্তা, আচার আচরণে গ্রামের সরলতা। কতদিন গল্প করতে করতে রাত হয়ে যেত। অন্ধকার রাস্তা। নিজেই টর্চ নিয়ে বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন। কী অপার স্নেহ।

দ্বিতীয় শিক্ষক জ্যোতিভূষণ চাকী। খুব সামান্য সময়ের জন্য তাঁকে পেয়েছি। 'মানুষ কী করে লিখতে শিখল' এই বিষয় নিয়ে ছোটদের জন্য একটা বই লিখছিলাম। সেই সূত্রেই তাঁর কাছে যাওয়া। সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক। হাসিমুখে



বলতেন, 'কী লিখেছ পড়ে শোনাও'। এক এক দিন একটা করে অধ্যায় পড়ে শোনাতাম। তারপর তিনি বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতেন। কোনো চাওয়া পাওয়া নেই, শুধু দেওয়া। শেষ অধ্যায়ের পাঠ শেষ হতেই বললেন, 'এই রকম একটা লেখা লিখব ভেবেছিলাম। তোমার লেখাটা খুব ভাল হয়েছে। তুমি লেখ, আমি আর লিখব না।' কিছু বলার ছিল না আমার।

আর একজন অধ্যাপক রামরাম চট্টোপাধ্যায়। জীবনের মধ্যবয়সে তাঁর সঙ্গে পরিচয়। পরিচয় গভীর হতেই অনুভব করেছিলাম সেই হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন কালের আচার্যকে। জ্ঞানতাপস বিশাল হৃদয়ের মানুষটার কাছে দিন রাত যখনই কোনো জিজ্ঞাসা নিয়ে গিয়েছি অকপট সারল্যে আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন। প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছি তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ভালোবাসা। গ্রীষ্মের প্রখর রোদে ঘরে বসে লিখছি। লোডশেডিং। দরদর করে ঘামছি। স্যার এসেছিলেন কোনো কাজে। কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। পরের দিন ইনভার্টার কিনে নিয়ে এসে বললেন, 'আর কষ্ট হবে না। এবার মন দিয়ে লিখতে পারবে।' শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক কখন যে পিতা পুত্রের সম্পর্কে পরিণত হয়েছে জানতেও পারিনি।

**লেখক পরিচিতি**—*বহু ছোটগল্প ও উপন্যাসের লেখক। জন্ম কলকাতায়। ছাত্রজীবন দুর্গাপুরে। হাতেখাড়ি অনুবাদ সাহিত্যে। প্রথম মৌলিক উপন্যাস 'জগন্নাথ, তোমাকে প্রণাম' (আঃ বাঃ পূজা সংখ্যা) কলকাতা বইমেলায় সেরা উপন্যাস নির্বাচিত হয়। ২০১১ সালে শুরু গঙ্গা পরিক্রমা। আট বছরের পরিশ্রমের ফসল গঙ্গার উপর একাধিক বই, আটটি ভাষায় অনূদিত। সাম্প্রতিক উপন্যাস 'অমৃতপাত্র'। ছাত্রদের জন্য জনপ্রিয় মোটিভেশনাল বই—'তুই কিছু পারিস না'।*

# সুমন স্যার, খলিল স্যার

## ড. মানস প্রতিম দাস

শাসন আর প্রশংসা, এ দুটো না মিললে শিক্ষার্থীর শৃঙ্খলা আর বিকাশ নিশ্চিত করা যায় না। তবে শিক্ষকের যোগ্যতা উপযুক্ত না হলে এ দুটোর কোনোটাই সম্ভব হয় না। শুধুমাত্র পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষককে পাকা জহুরী করে তুলতে পারে না। আমাদের স্কুলের শিক্ষক সুমনবাবুর মধ্যে আমরা পেয়েছিলাম মৃদু বকাঝকা আর অঢেল ভালেবাসার এক অদ্ভুত সমন্বয়। ক্লাস সিক্সে যখন পড়ি তখন উনি ইতিহাস পড়ানোতে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ছিলেন। আমার তো বেশ ভালো লাগত বিশ্ব ইতিহাস নিয়ে নানা ঘটনার ব্যাখ্যা। ক্লাসের মধ্যে প্রশ্ন করে উত্তর পেলে খুব খুশি হতেন তিনি। মিষ্টি একটা হাসি লেগে থাকত ঠোঁটে। বলা যায়, ওই হাসিই ওনার পরিচয়পত্র। মানুষটা অনেক পড়তেন আর নিজের জ্ঞান কখনও সখনও ছোটদের মত করে শোনাতেন। সিলেবাসের বাইরে এই পাঠদান আমার মানসিকতা গঠনে খুব সহায়ক হয়েছিল।

স্কুলের মাঠে খেলাধুলোয় আমাদের সহযোগী হয়েছেন সুমনবাবু। হাঁটু অবধি প্যান্ট গুটিয়ে তাঁর ফুটবল খেলা এখনও মনে ধরা আছে আমার। সরস্বতী পুজোর সময়েও তিনি থাকতেন ছাত্রদের সঙ্গে। দেওয়াল পত্রিকা যাতে ঠিক সময়ে প্রকাশিত হয় তার জন্যও ছোটাছুটি করতেন তিনি। মুখের সেই হাসিটা কিন্তু সরত না। নববারাকপুর উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের এই অনন্য শিক্ষককে স্মরণ করি শ্রদ্ধায়।

আর একজন মাস্টারমশাইয়ের কথা বলতে ইচ্ছা করে। তিনি মহম্মদ খলিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের ক্লাস নিতেন তিনি। পড়াতেন



'জেনারেল প্রপার্টিজ অফ ম্যাটার'। মাঝারি উচ্চতার মানুষটির বাঁধা পোশাক ছিল সাদা জামা আর গাঢ় রঙের প্যান্ট। যেমন সুন্দর করে কেচে পরিষ্কার করা সে সব জামাকাপড়, তেমনই নিখুঁতভাবে ইস্ত্রি করা। এই পরিচ্ছন্নতার ছাপ থাকত ব্ল্যাকবোর্ডে তাঁর লেখাতেও। বোর্ডের এই কোণ থেকে ওই কোণ ভরে যেত তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরে। আমরা লিখে নিতাম কোনো গোলমাল না করে। শিক্ষার্থীদের মনে ধোঁয়াশা রাখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না স্যারের। এমন বইয়ের উল্লেখ করতেন যেটা পড়ে বুঝতে পারতাম সবকিছু।

ক্লাসের বাইরে স্যারের সঙ্গে দেখা হলে মৃদু হাসতেন। কোনো সংশয় থাকলে জিজ্ঞেস করতাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঝিলটার পাশে দাঁড়িয়ে বুঝিয়ে দিতেন তিনি। শরীর টানটান রেখে, সামনের দিকে চোখ রেখে, ধীর পায়ে তাঁর সেই হাঁটা মনে পড়ে এখনও। স্নাতকস্তরের পর তাঁর সঙ্গে আর কথা হয়নি। কিন্তু ভাল লাগার স্মৃতি রয়ে গিয়েছে সঙ্গে।

**লেখক পরিচিতি**—*আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিভাগের অনুষ্ঠান প্রযোজক, বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে লেখালেখি করছেন। বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে তাঁর অবদান নানা মহলে স্বীকৃত।*

# প্রিয় শিক্ষক রাজরাখাল তরফদার

## ড. রাধাগোবিন্দ ঘোষ

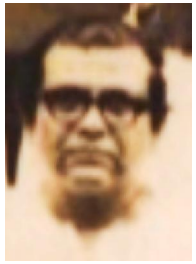

স্মৃতি সতত সুখের নয়, স্মৃতি বেদনারও বটে। আমার ফেলে আসা স্কুলজীবন এবং প্রাক্তন শিক্ষকদের ঘিরে হাজার দিনের অসংখ্য স্মৃতি। কোনো স্মৃতি আনন্দে মধুর, আবার কোনো স্মৃতি বেদনায় বিধুর। আমার শ্রদ্ধাভজন সব শিক্ষকদের ত্যাগপূত জীবনগাথা নিয়ে লিখতে পারলে সুখী হতাম। অনুরুদ্ধ হয়েছি একজন শিক্ষকের পবিত্র জীবনকাহিনী সম্বন্ধে কিছু লিখতে। তাই এই সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণা।

১৯৫০ সালে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে চতুর্থ শ্রেণিতে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হই। পঞ্চম শ্রেণিতে একজন পবিত্রহৃদয় শিক্ষককে শ্রেণিশিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলাম। তিনি রাজরাখালবাবু। দিনাজপুরের লোক। দেশ বিভাগের পর মালদহের ফুলবাড়িতে থাকতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ। বি টি পাশ করেছিলেন বেলুড় বিদ্যামন্দির থেকে। ধীর স্থির, প্রশস্ত ললাট, স্বাস্থ্যবান, হাসিতে ভরা এক নিটোল মানুষ। শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে কোনদিনই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেননি। পাঠ্যসূচির বাইরে বিস্তীর্ণ জগতের বিশাল দিকগুলি বড় সুন্দরভাবে তুলে ধরতেন। ফলে অবন ঠাকুর, ঠাকুরমার ঝুলি, রবীন্দ্রনাথ, উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের জিম করবেট, শেলী, বায়রন, তারাশঙ্কর, জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণের বিভিন্ন সাতিত্যকীর্তি ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরতেন। স্কুল শুরু হত উপনিষদের অমৃতময় বাণী, 'ওঁ সহনাববতু সহনৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ,



তেজস্বীনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ, ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!' দিয়ে। তাঁর সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর আজও কানে বাজে। স্কুলে সারা বছর ধরে কত অনুষ্ঠান! প্রতিটি অনুষ্ঠানে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ছিল মনে রাখার মত। তিনি ভাল আবৃত্তি করতেন। খুব সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত জানতেন। অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের আবৃত্তি এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নাটক ছিল আবশ্যিক। তিনি নাটক লিখতেন। তাঁর বহু নাটক স্কুলে অভিনীত হয়েছে এবং উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক পত্রিকা 'যুগশঙ্খ'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। যুগশঙ্খ ছিল তাঁর প্রাণ। অনন্ত পরিশ্রমে তিনি যুগশঙ্খের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে গেছেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্কুল পত্রিকাগুলির মধ্যে যুগশঙ্খের এক উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। এ ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণির দেওয়াল পত্রিকা রচনাতেও ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। তাঁর হাতে গড়া ছাত্র সৌভাগ্য বিশ্বাস এবং চয়ন ব্যানার্জী মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে। তাঁর হৃদয়স্পর্শী শিক্ষকতার স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত হন ১৯৮৭ সালে। তিনি কোনোদিন টিউশন করেননি। শিক্ষকতার সামান্য অর্থ দিয়ে দরিদ্র অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিনামূল্যে করে গেছেন। আজকের ঘুণধরা সমাজব্যবস্থায় রাজরাখালবাবুর মত আদর্শনিষ্ঠ মানুষের সংখ্যা ক্রমেই কমতে বসেছে। মর্তের ধূলায় তাঁকে আর কোনদিন খুঁজে পাব না। রাজরাখালবাবু তাঁর সমস্ত হৃদয়বত্তা নিয়ে আমার স্মৃতিতে চিরদিন সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

**লেখক পরিচিতি**—*উত্তরবঙ্গের একজন প্রথিতযশা শিক্ষক ও সাহিত্যিক। ছোটবেলা থেকেই সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত। শিক্ষকতায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রাপ্তি সমাজের নানান কাজে আত্মনিয়োগ করার মানসিকতা আরো বাড়িয়ে দেয়। ফলস্বরূপ অবসরের পরে বঙ্গরত্ন সম্মাননায় ভূষিত হন।*

# আমার বাবা, আমার শিক্ষক

## ধীমান শঙ্কর

Never borrow. Never loan. Never greed. Never keep pending. Never deprive. Never deceive.

এই শিক্ষা যিনি আমার ভাবনার মূলে প্রোথিত করেছেন জীবনের শুরুতেই, তাঁকেই আমি সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলে মানি।

প্রত্যক মানুষ—তিনি শিল্পী হোন বা শিক্ষক, বা কর্মজীবনে যে কোন পেশায় সফলতার চরম উচ্চতায় পৌঁছান—এই উত্তরণে গুরু বা শিক্ষকের ভূমিকা অতুলনীয়। জীবনের পরতে পরতে অনেকেই জড়িয়ে থাকেন। তাই কোনো একজনের কথা বলা বা একজনকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে বেছে নেওয়া খুবই কঠিন কাজ। তবে, এ কথা অনস্বীকার্য যে পিতৃদেব দেব কুমার মুখার্জি আমার সেই শিক্ষক যিনি আমাকে আজ ধীমান শংকর হিসাবে গড়ে উঠতে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছেন।

৫ ফুট ৯ ইঞ্চি উচ্চতা, ৪৪ ইঞ্চি বুকের ছাতি, দীপ্ত কণ্ঠস্বর, রাশভারি চেহারা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি। এই মানুষটি কলকাতায় এসে পড়াশোনা করেছিলেন স্কটিশচার্চ কলেজে। অবশেষে, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী।

একদিকে তিনি যেমন দায়িত্বশীল সন্তান, অন্যদিকে ভাই বোনদের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান। তাঁর এই জীবন-দর্শন আমাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। ছাত্রাবস্থা থেকে তাঁর চলে যাওয়া অবধি কোনদিন দেখিনি কোন দাম্ভিকতা, অশিক্ষা, অপকর্ম, সর্বোপরি কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া। তিনি



সময়ের দাম ও কথার দাম দিতেন বড্ড বেশি। ছোট ছোট কাজের মধ্যে বলতেন এটা করো, এটা ভালো। ওটা কোরো না, ওটা ভালো নয়। ওই সতর্কবাণী সারাজীবন আমার কাজে লেগেছে।

তাঁর চা ও ধূমপানের নেশা থাকলেও আমার হাতে প্রথম চায়ের কাপ দেখে তা ভেঙে দিয়েছিলেন। তাই বোধহয় আজও আমি সব ধরনের নেশা থেকে অনেক অনেক দূরে।

শিশুসাথী, পাঠভবন, সাউথ পয়েন্ট স্কুল, মৌলানা আজাদ কলেজ, বাণীচক্র এবং উদয়শঙ্কর ইন্ডিয়া কালচার সেন্টার—সর্বত্র পেয়েছি তাঁর সাহচর্য। তাই আমি হতে পেরেছি আজকের ধীমান শংকর যা তিনি চেয়েছিলেন। তাঁর জীবনে আরও একটি বৈশিষ্ট্য যেটা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল—মুখ থেকে পড়ে যাওয়া একটি ভাতের কণাও কুড়িয়ে খেতেন তিনি। এক টাকার হিসাব না মেলা পর্যন্ত কতটা অস্থির থাকতেন তিনি। তাঁর কষে দেওয়া জীবনধারার হিসাবের মধ্যে আজও আমি জীবন অতিবাহিত করে চলেছি। আজ শিক্ষক দিবসের পুণ্য অবসরে আমার সেই প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষককে প্রণাম জানাই।

**লেখক পরিচিতি**—*প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী। মমতা শঙ্কর ব্যালে ট্রুপ ও আনন্দ শঙ্কর ব্যালে ট্রুপের সদস্য হিসাবে বহু দেশে ভ্রমণ করেছেন। শ্যামানন্দ জালান ও চেতনা জালান প্রোডাকশন হাউসে কাজ করেছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করেছেন। দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন সংস্থার সম্মানিত সদস্য।*

# আমার প্রিয় শিক্ষক

## রবার্ট চার্লস ডেউড ধর (এস.জে.)

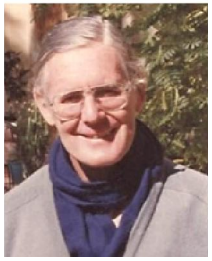

আমি রবার্ট চার্লস ডেউড ধর (এস.জে.) একজন সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার ও ফিল্ম প্রোডিউসার। জন্মসূত্রে আমার ছোটবেলা কেটেছে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে। আমার সৌভাগ্য আমার শৈশবের অনেকটা সময় আমি কাটাতে পেরেছি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ফাদারদের সাথে। একজন শিক্ষকই পারেন তাঁর শিক্ষা, আদর্শ দিয়ে আমৃত্যু একটি শিশুর মনের মধ্যে স্থানলাভ করে নিতে। আমার জীবনে এমনই একজন শিক্ষক ছিলেন ফাদার মাইকেল ইথার। একজন শিক্ষার্থীর যে অন্তর্নিহিত প্রতিভা থাকে তা অনুধাবন করার অদ্ভুত একটি ক্ষমতা ছিল ফাদার মাইকেল ইথারের মধ্যে। ছোটবেলা থেকেই বড় চঞ্চল, দুরন্ত ছিলাম আমি। কিন্তু পড়াশোনা, নাচ, গান ইত্যাদিতে ছিলাম সমান মনোযোগী। চিরকালই গান আমার জীবন। যখন আমার চার বছর বয়স, ভাল করে হারমোনিয়ামের বেলো টানার ক্ষমতা ছিল না—তখনও হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করার চেষ্টা করতাম। একবার প্রচণ্ড উৎসাহে গান গাইতে গিয়ে স্কুলের ডেস্ক ভেঙে ফেললাম। তখন আমার ক্লাস টিচার থেকে শুরু করে অন্য সব টিচাররাও আমাকে প্রচণ্ড ভর্ৎসনা করতে শুরু করেছিলেন। আমি সেই দিনটা ভুলব না কোনদিনও, যখন মাথা নিচু করে আমি তাঁদের বকাবকি শুনছিলাম, আর দু'চোখ বেয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছিল। সেই মুহূর্তে হঠাৎ ফাদার এসে বলেছিলেন, তোমরা যে ওকে বকাবকি করছ—একবার ওর গানটা শুনেছ? আমাকে সব টিচার-এর



মাঝে দাঁড় করিয়ে গানটা শোনাতে বলেছিলেন ফাদার। সবাই তখন মন্ত্রমুগ্ধ। আমি গান করছি আর কাঁদছি—চোখের জলে ঝাপসা হয়ে উঠছে একজনের সুদীর্ঘ, সুদর্শন অবয়ব—তিনি আমার ফাদার মাইকেল ইথার। ফাদারের সাথে আমার শৈশবের অনেকটা সময় নানান গল্প, গানবাজনার মধ্য দিয়ে কাটত। এরকমই একদিন গল্প করতে করতে প্রকাশ পেল—আমার ঠাকুরদা প্রয়াত ড. সুবিমলকান্তি ধর (যিনি ছিলেন যাঁরা পরবর্তীকালে ফাদার হবেন তাঁদের শিক্ষক) -এর ছাত্র ছিলেন মাইকেল ইথার। আরো ঘনিষ্ঠ হ'ল আমাদের সম্পর্ক। তখন আমায় উনি বললেন, 'You can call me grandpa'. প্রায়ই ওনার রেসিডেন্সে আমি ওনার সাথে কাটাতাম, ধর্মপুস্তক পড়ে আর ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে সুন্দর সময় কাটাতাম। আমরা। সেই মুহূর্তগুলো আজও আমার মনের মণিকোঠায় জ্বলজ্বল করে। এরপর খুব অল্পবয়সে কর্মসূত্রে আমি বিদেশে চলে যাই, বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল আই টি কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করি। দেশে-বিদেশে বহু বরেণ্য মানুষের সংস্পর্শে আসি। সিনেমার জগতে প্রযোজনায় যুক্ত হই। তবু যখন অবসর সময়ে একাকিত্ব ঘিরে ধরে চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমার শৈশবের সেই মুহূর্তগুলো যেখানে ছোট্ট বাবাই ফাদারের পাশে বসে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, আর ফাদার পরম স্নেহে তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

জীবনে আজ অনেক কিছুই পেয়েছি কিন্তু সেন্ট দিনগুলো ভুলতে পারিনি। আমার শৈশব মনে মাইকেল ইথার স্থানলাভ করে নিয়েছিলেন—শিক্ষক মাইকেল ইথার হিসাবে নয়—ফ্রেন্ড, ফিলজফার, গাইড মাইকেল ইথার হিসাবে।

আজ শিক্ষক দিবসে তাই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য—স্যার অন্তরীক্ষ থেকে আশীর্বাদ করবেন, মানুষ হিসাবে যেন পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারি—শুধুই মেধাবী ছাত্র হিসাবে নয়।

**লেখক পরিচিতি**—*চলচ্চিত্র জগতের পরিচিত নাম, এবং ইঙ্গ-ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ সংস্থা রিল ডিজিটাল স্টুডিও মিডিয়া পার্টনার্স অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা। কর্মসূত্রে বিভিন্ন প্রযুক্তি সংস্থার সাথে যুক্ত থেকেছেন এবং আমেরিকা, ইংল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা, ফিলিপিন্স প্রভৃতি দেশে অবস্থান করেছেন।*

# As I think of an Ideal Teacher...

**Dr. Nipam Kumar Saikia**

As I thought to write this write-up, these thoughts came to my head:

Hungry soul
Look at the burning candle
you will meet the teacher
And see your chosen road

Any individual on earth who can, directly or indirectly, inspire us to become our own person is our teacher. And if we really know the art of learning, the greatest teacher is our painful experience. ‘Our sweetest songs’, says Shelley, ‘'are those that tell of saddest thoughts.’ I heard some great men say that the greatest university is the jail. To be honest, I don't have one favourite teacher. I have learnt different things from different teachers.

I firmly believe that teaching is fundamentally a performing art and to master it the teacher has to work tirelessly Plato laid down the principles of good speech in *Phaedrus*, which can also be applied to good teaching. The first principle is a thorough knowledge of the subject. But knowledge alone will not make him an ideal teacher. He has to impress the students. Therein lies the importance of the art of speaking. The third principle is



that the teacher's thoughts upon the subject taught must follow each other in a natural sequence - the first thing first, and the last thing last, so that all the thoughts together may form an organic whole. The fourth, the teacher must have an acute awareness of the whims and prejudices, likes and dislikes and attitudes and ideas of his or her students. I would like to add one thing to these four principles. When we apply all these four principles formulated by Plato for a good speech to teaching, we can’t afford to lose sight of the fact that all these must stem from one thing : love. Love is not just a word. It is a commitment. Scott Hayden very rightly says that teachers have three loves : love of learning, love of learners, and the love of bringing the first two loves together. Great teaching has got more to do with our attitude towards our students, our subject, and our work. In the process the teacher becomes an awakener. Great teacher is indeed an awakener. However we are in a technologically advanced age when YouTube has become the greatest university, there is no substitue to the teacher who is an awakener. I am yet to become such a teacher. But I have the dream to become one.

‘The teacher who is indeed wise’, says Khalil Gibran, ‘does not bid you to enter the house of his wisdom, but rather leads you to the threshold of your mind’. Every teacher, if he or she is true, knows his or her teaching builds on the teachings of other teachers, great and small, and it is a continuous process; he or she realises the poetic truth of the theory of relativity. On this day, I would lke to say that I am indebted to all my teachers, great and small, living and dead.

***About the Writer*** *– Teacher in the Department of English, Biswanath College (affiliated to Gauhati University), Assam. Elocutionist and singer.*

# আজও সাথে কালিকা প্রসাদ

## ঋষি চক্রবর্তী

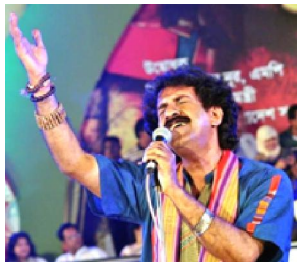

গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরংব্রহ্মাম্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

ছোটবেলা থেকে মালদা জেলায় বড় হয়ে ওঠার কারণে স্বভাবতই সেখানকার লোকজ সংস্কৃতি 'গম্ভীরা'-র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং শেখার কাজও শুরু হয় খুব অল্প বয়সেই। মালদা জেলার খুব ছোট্ট একটা শহর ছিল চাঁচল, তাই একদম ছোটবেলায় আমরা খুব বেশি বিনোদনের মাধ্যম দেখিনি। আর সেই কারণেই বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা প্রায় ছিল না বললেই চলে। শুধুমাত্র ক্যাসেট বা সিডি-র মাধ্যমে শুনতে পেতাম পছন্দের বাংলা গানের দল 'দোহার'-এর গান। বেশ কয়েকটা গান তুলেও ছিলাম। ইচ্ছা ছিল কলকাতা শহরে কখনও এলে এই দলের সাথে একদিন নিশ্চয় দেখা করব। চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশন থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পরেই বাবা কলকাতা নিয়ে এলেন উচ্চতর শিক্ষার জন্য। শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। পরিচয় হল আমার মত আরও অনেক লোকসংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের সাথে। আদান-প্রদান হল গান-সহ লোকজ সংস্কৃতির। কিন্তু কিছুতেই আমার সেই পছন্দের দল 'দোহার'-এর নাগাল পেয়ে ওঠা হয়নি।

একটা কথা রয়েছে, আমরা মন থেকে কোন কিছু চাইলে সারা জগৎ সেটা পাওয়ানোর জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। আমার ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই ঘটেছে।



সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় একটি রিয়ালিটি শো-তে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আলাপ হয় 'দোহার' দলের সাথে। বিশেষ করে সেই দলের মধ্যমণি শ্রীকালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য-র সাথে। আলাপচারিতায় কাটতে থাকে দিন, শুরু হয় তাঁর কাছ থেকে শেখা। খুব জোর গলায় আমি বলি যে সত্যিই একজন মানুষের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল যাঁর মান এবং হুঁশ দুটোই রয়েছে। গান তো শেখা হয়েইছে, পাশাপাশি এই মানুষটি শিখিয়ে দিয়েছেন যে জীবনটা কেমন হওয়া প্রয়োজন। সহজ-সরল স্বভাবের এই মানুষটি শিখিয়েছেন কীভাবে সবাইকে আপন করে নেওয়া যায়, এমন কি পরম শত্রুকেও। শিখিয়েছেন যে এই সমাজে মানুষ কখনো একা চলতে পারে না, তাই সংঘবদ্ধ হতে হয়। সব সময় তিনি দল বেঁধে কাজ করার পক্ষে দাঁড়াতেন। আজও প্রতিনিয়ত আমার কানে অনুরণিত হয় তাঁর সেই কথা কয়টি—'অচেনা রাস্তায় হাঁটা শুরু কর। চেনা রাস্তায় সবাই হাঁটতে পারে। অচেনার খোঁজ কর। যদি কিছু না পাস, সেই পথে হেঁটে ফিরে আসিস। তবে যদি কিছু পাস তবে আবিষ্কারের মজাটা বুঝতে পারবি।' শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে জীবনকে সহজ সরল করা যায় মানুষকে সম্মান জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। সকল শ্রেণির, সকল ধর্ম, সকল কর্ম এবং বর্ণের মানুষকে সম্মান করতে দেখেছি তাঁকে।

লেখার শুরুতে একটি মন্ত্র লিখেছিলাম। যার অর্থ—পরম গুরু—ব্রহ্মার মত সৃষ্টিশীল, বিষ্ণুর মত রক্ষাকারী এবং শিবের মত ধ্বংস জানেন। কালিকা-দার জন্য এটা যথার্থ বলেই মনে হয়। নতুন পথ দেখানো ও চেনানোর মধ্য দিয়ে তিনি ব্রহ্মা, এবং বাংলার লোক-শিল্পীদের সম্মান জ্ঞাপন ও এই সংস্কৃতিকে বাঁচানোর তীব্র ইচ্ছা তাঁকে বিষ্ণুর মর্যাদা পাইয়েছে। সর্বশেষে একত্রিত হয়ে কাজ করা শেখানোর মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের ভেতরকার হিংসা দ্বেষ, ক্রোধকে ধ্বংস করে শিবের মতনই কাজ করেছেন।

**লেখক পরিচিতি**—*লোকগীতির জনপ্রিয় শিল্পী। জন্ম ও বেড়ে ওঠা মালদা জেলার চাঁচলে। এই জেলার বিখ্যাত সঙ্গীত গম্ভীরা দিয়ে হাতেখড়ি ঋষির। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে কলকাতা শহরে কালিকাবাবুর সাহচর্যে টিভিতে আত্মপ্রকাশ। বর্তমানে বাংলা লোকগীতি পরিবারের অন্যতম সদস্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।*

# আমার শিক্ষক

## সুদীপ্ত কুমার চক্রবর্তী

আমার শিক্ষক নিয়ে লিখতে গিয়ে কত শ্রদ্ধেয় মানুষের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে যাঁদের অনেকেই আজ ইহলোকে নেই। মা, বাবা, শৈশবের গৃহশিক্ষক, কাটোয়াতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে শিক্ষক আমাকে কোলে বসিয়ে নিয়ে পড়াতেন, খাগড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুদক্ষ হেড টিচার গৌর বাগচি, মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের বরেণ্য শিক্ষক ও মহারাজগণ, বহরমপুর জে এন একাডেমির সহঃ প্রধান শিক্ষক হিমাংশুবাবু, শিক্ষক সোমনাথবাবু, অসীমবাবু, দীপঙ্করবাবু, কে এন কলেজের অধ্যাপক অরুণ সরকার—কাকে ছেড়ে কাকে রাখি!

খুব বেশি করে মনে পড়ে যাঁকে তিনি আমার মাতামহ ফণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, তৎকালীন বিখ্যাত ফণীবাবু। খাগড়া জি টি আই-এর শিক্ষক ছিলেন। একাধিক বিষয়ে এমন অগাধ পাণ্ডিত্য আমি খুব কম মানুষের মধ্যে দেখেছি। ছোটবেলায় আর পাঁচটা বাচ্চার মতোই খুব ভয় পেতাম ইংরেজিকে। অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে ৩৬ পেয়েছিলাম। তারপর ক্লাস নাইনে দাদু আমাকে তিন মাস ইংরেজি শিখিয়েছিলেন। ছন্দে ছন্দে ছড়ায় ছড়ায় তাঁর শেখানো যে অনবদ্য পদ্ধতি আমি তো আজ পর্যন্ত কোথাও দেখিনি। ইংরেজিকে ভালবাসতে শিখলাম, সহজ ভাবে, শুদ্ধভাবে লিখতে শিখলাম এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারলাম। আমার শেখানোর পদ্ধতির মধ্যে হয়তো দাদুর প্রভাব কিছুটা রয়ে গেছে বলেই ছাত্রদের মধ্যে এখনো সমাদর পাই। বাংলা, সংস্কৃত, অংক, ভূগোল ও ইতিহাসেও দাদুর বিস্তৃতি ছিল অগাধ। দাদুর সেই ঋজু চেহারা, সেই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, সেই দীপ্তিমান চোখদুটির কথা ভাবলে আজও শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়।

তবে আজও যে শিক্ষক আমায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন তাঁর মত আর কাউকে খুঁজে পাই না। তাঁর সঙ্গে যখন আমার প্রথম আলাপ তখন আমার বয়স বোধ হয় পনেরো-ষোল। অনভিপ্রেত কোন একটা বিষয়ে পশ্চাৎপদ হয়ে আমি যখন ফিরে আসছিলাম চোখে জল নিয়ে, তিনি আমার কাঁধ চেপে ধরলেন।



গম্ভীর গলায় বললেন, ''পুরুষ মানুষ, পালিয়ে যাচ্ছো কেন? অনেক বছর আগে কাশীতে দুর্গা মন্দির থেকে ফিরে আসবার সময় একদল বাঁদর আমায় তাড়া করেছিল। আমি পালিয়ে যাওয়ার উপক্রম করতেই এক সাধু আমায় বললেন, পালিয়ে যাচ্ছ কেন? ওদের মুখোমুখি হও। Face the brute. তখন থেকেই আমি আর পিছু হটিনি। জীবনে সাহস আর পৌরুষের চেয়ে বড় কিছু নেই।''

একদিন ঘর বন্ধ করে চোখ বুজে ধ্যানে মগ্ন হওয়ার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ দরজায় করাঘাত। দরজা খুলে দেখি দাঁড়িয়ে আছেন মাস্টারমশাই। বলছেন 'চোখ বন্ধ করে নয়, ধ্যান করো তাকিয়ে। বেরিয়ে এসো দরজা খুলে। বাইরে দেখো মানুষের কত যন্ত্রণা। তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াও। প্রতিনিয়ত মানুষের মধ্যে, জীবের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করো। সেই তোমার সবচেয়ে বড় ধ্যান। মানুষকে, জীবকে ভালোবাসতে শেখো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি কি পারব?' অসম্ভব দীপ্তিমান চোখদুটি দিয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর বললেন, 'দুর্বলতা আর কাপুরুষতার চেয়ে বড় পাপ আর নেই। তোমার মধ্যে সমস্ত সম্ভাবনা, তোমার মধ্যে সমস্ত ক্ষমতা। বিশ্বাস করো। বিশ্বাস বিশ্বাস বিশ্বাস—জ্বলন্ত অগ্নিময় বিশ্বাস। সৎ হও আর পবিত্র হও।' আমি প্রণাম করলাম মাস্টারমশাইকে। আশীর্বাদ করে বললেন, ''শ্রদ্ধাবান হও, বীর্যবান হও, কাপুরুষতা দূর করো, আর পরের জন্য জীবনপাত করো। মরচে পড়ে মরে যাওয়ার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরে যাওয়া ভালো। জীবনে কিছু একটা করে দেখাও। পৃথিবীতে এসেছো। দাগ রেখে যাও। পশুদের মতো জীবন যাপন করো না। প্রতি মুহূর্তে মনে রাখ—তুমি মানুষ, ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। তোমার প্রতিটি কাজে, তোমার সমস্ত ভাবনায়, তোমার চলাফেরায় যেন সেই মনুষ্যত্বের দিব্য প্রকাশ ঘটে।''

এই মাস্টার মশাইকেই জীবনের ধ্রুবতারা মনে করে প্রাণপণে মেনে চলার চেষ্টা করি। খুব খুব কঠিন। তবু আজীবন প্রয়াস চলবে।

**লেখক পরিচিতি**—*সহকারী প্রধান শিক্ষক, মুর্শিদাবাদের সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। আনন্দবাজার সহ নানান পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেন। তিনটি অনূদিত পুস্তক রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৪ সালে জেলার কৃতী শিক্ষক হিসাবে স্বীকৃতি। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজের সাথে যুক্ত।*

# রামকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

**ড. রঞ্জিত কুমার সুর**

আমার চোখে দেখা, সঙ্গে কাজ করা ও সুখ-দুখের সাথী হয়ে থাকা দিনের কথা মনে করে বলতে ইচ্ছা করছে —

'এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন দিনে মন খোলা যায় —
এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।'

স্মরণ করি তাঁকে। রামকৃষ্ণ ঘোষ—রাশভারি মানুষ, গণিতের পাহাড়। কত ভালবাসা পেয়েছি তাঁর কাছে গণিতকে শেখার জন্য, প্রয়োগের জন্য। এমন মানুষ, একজন বাঙালি হয়ে একটা বিদেশি কলেজের বিজ্ঞানের 'প্রধান'। ডানদিকে উনি, বামদিকে ও সামনে বিদেশি প্রধানরা। কলকাতার নামী কলেজ সেন্ট জেভিয়ার্সের কথা বলছি। বাড়িতে W.B.C.S, I.A.S, M.C.A (Entrance)-এর ব্যবস্থা। বহু গুণী ছাত্র বেরিয়েছে এখান থেকে—আমার দেখা। কোনো এক সময়ে W.B.C.S.-এর গণিত ও M.C.A (Entrance)-এর গণিতের পূর্ণ দায়িত্ব আমার। আজও ভুলিনি, কত সুন্দরভাবে আমাকে বলতেন—ছাত্রদের কাছে যেতে হবে, ওদের অসুবিধা বুঝতে হবে, তবেই তুমি প্রকৃত শিক্ষক হবে। জানি না প্রকৃত শিক্ষক হতে পেরেছি কিনা, তবে হ্যাঁ ছাত্রদের কাছে যেতে পেরেছি, বহু গুণী ছাত্র তৈরিও করেছি। ওনার ছোঁয়া আমাকে পাথেয় দিয়েছে।

যখনই গিয়েছি কথা বলতে, সবসময় গণিত নিয়ে কিছু না কিছু করছেন।



কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কেপ্ কোস্ট বিশ্ববিদ্যালয় (ঘানা) কিছুদিন অধ্যাপনাও করেছেন। গণিতের স্নাতক-স্তরে অনেক বই লিখেছেন। আজ যে কারিগরি বিদ্যার যৌথ পরীক্ষা হয় তার গণিতের পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। চোখে দেখা, কত গুণী অধ্যাপকদের কথা শুনছেন এবং উনি শোনাচ্ছেনও। এত মধুর ব্যবহার—একসঙ্গে বইমেলায় যাওয়া, একসঙ্গে কোন আলোচনা সভায় সঙ্গী হওয়া—এসব ওনার সৌজন্যে। তাঁর কল্যাণে আমিও আজ অনেক সম্মানের অধিকারী হয়েছি ও হতে চলেছি। কিন্তু ওনাকে হারিয়ে মাঝে মাঝে ক্লান্ত লাগে। কিন্তু মনের উদ্দীপনাকে ক্লান্তির ঊর্ধে রাখতে পেরে আজও পরম উদ্যমে কাজ করে যাচ্ছি। ওনার কথামত বইপত্রও লিখে যাচ্ছি। সত্যিই উনি আমার আদর্শ শিক্ষক। তাই বলি,

'আমার ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও,
ডাকো তারে।' ...

মৃত্যুর আগে সেবার ধর্মে আপ্লুত হয়েছি, আর ভেবেছি এই মানুষের মৃত্যু আমার কাছে নেই, পুরানো প্রথিতযশা ছাত্রছাত্রীর কাছে নেই। আজ বড় অভাব বোধ করি, স্মৃতিচারণ করি পুরানো কথাগুলি আর আফশোস করি— তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা হলো না। আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। যেখানেই থাকুন ভাল থাকুন—আশীর্বাদ করুন।

**লেখক পরিচিতি**—*গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এখান থেকেই 'ইকোনোমেট্রি'-তে পি এইচ ডি। স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে পড়াশোনা কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে। অধ্যাপক ও অতিথি বক্তা হিসাবে কাজ করেছেন দেশে ও বিদেশে। বর্তমানে মর্যাদাপূর্ণ চাকরির পরীক্ষাগুলির জন্য ছাত্রদের গণিত বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার কাজে রত।*

# আমার প্রিয় শিক্ষক

## ড. চন্দন মিশ্র

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছি প্রায় দুই দশক সময়কাল। শৈশব থেকে এ পর্যন্ত নিজেকে ছাত্রই রেখেছি। কখনো শিক্ষক হয়ে ওঠার চেষ্টা করিনি। মনের জানালা খোলা আছে নতুন কিছু শেখার জন্য, কারণ প্রতি মুহূর্তেই আসছে নতুন পরিবর্তন এবং সেগুলো শেখাচ্ছেন কোনো না কোনো শিক্ষক, তিনি বয়সে ছোটই হন বা বড়। সুতরাং একজন প্রিয় শিক্ষক বেছে নেওয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজ। স্মৃতির সরণি বেয়ে মনের প্রান্তে অনেকেই ভিড় করে আসছেন যাঁদের স্নেহে, সান্নিধ্যে, সাহচর্যে শিখেছি অনেক কিছুই। শিক্ষক পরিবারে আমার জন্ম। আমার বাবা ড. সত্যেন্দ্রনাথ মিশ্র দীর্ঘ ৩৩ বছর শিক্ষকতা করেছেন। আমার জীবনে তিনি পরম পূজনীয় শিক্ষক, যাঁর আদর্শে আমার সারা জীবন অনুপ্রাণিত। শিক্ষক হিসাবে তিনি যে কত নিষ্ঠাবান ছিলেন, বর্তমানে একজন প্রধান শিক্ষক হিসাবে সেই বিষয়টি আরো ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

মেদিনীপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে এসে, নিতান্ত সঙ্গীহীন অবস্থায় প্রবল দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে দর্শন বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করার পর, বাবা শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন ১৯৭৩-এ। তাঁর ছিল প্রবল অনুসন্ধিৎসা এবং সেই চেষ্টা থেকে তিনি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রীও লাভ করেছিলেন। তাঁর জীবন ও কর্মপ্রয়াস আমার কাছে একটি মহান শিক্ষা। কখনও তাঁকে দমে যেতে দেখিনি, দেখিনি অন্যায়ের সাথে আপোষ করতে। সত্যনিষ্ঠ



এই মানুষটিকে দেখেছি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতে। ছাত্র ও পুত্র-র মধ্যে কোন তফাত কখনো করেননি। নিজের কাজে ছিলেন অসম্ভব নিষ্ঠাবান। প্রতিটি শ্রেণিতে কি পাঠ দান করেছেন এবং কোন ছাত্র কীভাবে সেটি গ্রহণ করেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ বাবার ডায়েরিতে দেখতে পেয়েছি। যে কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাতে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কীভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং কীভাবে তারা ভালো ফল করবে, এই বিষয়ে তাঁকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখেছি। মূল্যবোধের যে সুমহান আদর্শ তিনি দেখিয়েছেন, আজকের দিনে অনেক শিক্ষকের মধ্যেই সেই আদর্শ দেখতে পাই না।

সৎ এবং শ্রেয়-র দিকে তাঁর অমোঘ আকর্ষণ ছিল। কখনো কারো সমালোচনা করতে, নিন্দা করতে দেখিনি। যা কিছু ভালো বলে তিনি নিশ্চিত জানতেন, সেটা সকলকে বলার জন্য এবং আমরা যাতে তাঁর থেকে শিখতে পারি, সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সদা যত্নবান। সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অগাধ অনুরাগ ছিল। নিজে গান করতে পারতেন না, কিন্তু অসম্ভব ভালো শ্রোতা ছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে ধৈর্য সহকারে গান শুনতেন, ডায়েরিতে গানটি লিখে রাখতেন। নিজের শিক্ষকদেরকে পিতা-মাতার মতোই শ্রদ্ধা করতেন। দীর্ঘ কষ্টসাধ্য জীবনযাত্রায় নিজের শরীরের প্রতি দৃষ্টি দেননি। তাই অসময়ে অসুস্থতা এবং চাকুরি জীবন শেষ করার আগেই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। থেকে গেছে তাঁর অজস্র কাজ, লেখা, আদর্শবোধ, সত্যনিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা আর ছাত্র-বাৎসল্য। আমার জীবনে তিনিই শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তানপুরার সুর আর তবলার তাল যেমন সঙ্গীতকে সার্থক করে তোলে, শিক্ষক হিসাবে, পিতা হিসাবে আমার জীবনকে সঠিক খাতে অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে তিনি চালিত করেছেন। আমার কাছে তিনি সীমার মাঝে অসীম, মর্তের ভগবান।

**লেখক পরিচিতি**—*হাওড়ার রঘুনাথপুর নফর একাডেমি-র প্রধান শিক্ষক। জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির উপর গ্রন্থ ছাড়াও আছে একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের গবেষণাপত্র। ২০১৫ সালে চিনে শিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন।*

# আমার শিক্ষক

## বাপি মজুমদার

শুধু পুঁথিগত বিদ্যাদান করে যেমন কেউ প্রকৃত শিক্ষক হতে পারেন না, তেমনই শুধুই পুঁথিগত বিদ্যালাভ করে একজন তুখোড় ছাত্র এক শ্রেণি থেকে আরেক শ্রেণিতে সহজে উত্তীর্ণ হতে পারেন, পরবর্তী জীবনে মোটা মাইনের চাকরি করতেও পারেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে মানুষ নাও হতে পারেন। সেইজন্য স্কুলে শিক্ষকের পুঁথিগত বিদ্যাদান বা অন্য যে কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের শিক্ষাদানের পাশাপাশি মানবিক গুণের চর্চা থাকা জরুরি। কেননা পুঁথিগত শিক্ষার পাণ্ডিত্য কাউকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে পারলেও তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়েই থাকে। একমাত্র মানবিকতাবোধই কোনো মানুষের নিজের পাশাপাশি তার পারিপার্শ্বিক সমাজকে সুস্থ রেখে, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হয়।

স্কুলে দৈনন্দিন পাঠের পাশাপাশি সেই মানবিক হয়ে ওঠার শিক্ষাটাও ক্রমাগত ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে যেতেন। শিক্ষক নৃপেন্দ্র কুমার মজুমদার। অনেক বছর হল তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর দেখানো শেখানো পথেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে, অসহায় মানুষের হয়ে কথা বলতে কলম তুলে নিয়েছিলাম। এক কঠোর হৃদয়ের পাশাপাশি তাঁর দেওয়া মানবিকতার পাঠে একটা কোমল মনও পেয়েছিলাম। সেই শিক্ষা বুকে আগলেই আজও পথ চলি।

ক্লাস ফাইভে উঠে হাই স্কুলে ভর্তি হতেই শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলাম নৃপেনবাবুকে। পড়া না পারলে কান ধরে বেঞ্চে দাঁড় করাতেন, মারও দিতেন।



আবার কারও চোখে জল দেখলে বিচলিত হয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন। কিন্তু ক্লাসে নৃপেনবাবুর কঠোর অনুশাসন, পুঁথিগত বিদ্যার ফাঁক গলে সেই শৈশবেই ধীরে ধীরে মনের মধ্যে গেঁথে যেতে থাকল খোলা এক পৃথিবীর কথা। হিন্দু, মুসলিম, ধনী, দরিদ্র কথাগুলো যে আপেক্ষিক, তখন থেকেই তা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। সবার ঊর্ধ্বে যে মানবিকতা, পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি সেই পাঠ ক্রমাগত দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

বাংলাদেশের দিনাজপুর থেকে নৃপেনবাবু উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসেছিলেন একসময়। দিনাজপুরের মহারাজার উকিলের ছেলে, সাতমহলা বাড়ি ছেড়ে অজানা গন্তব্যে পাড়ি দিতে হয়েছিল। একজন মানুষ কেন অন্যজনের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়? মানবিকতা থাকলে একজন মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার, খালি পেটে থাকার প্রয়োজন পড়ে না। সেই উপলব্ধি থেকে নিজেকে প্রকৃত মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে নিয়োজিত করেন। ঘটনাক্রমে তিনি আমার বাবা হলেও তাঁর গুণমুগ্ধ অগণিত ছাত্রের মধ্যে আমিও একজন।

**লেখক পরিচিতি**—*বিশিষ্ট সাংবাদিক। মালদা জেলা তথা উত্তরবঙ্গে নির্ভীক সাংবাদিক হিসাবে একটি উজ্জ্বল নাম। 'মালদা সমাচার' পত্রিকায় সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। এরপর প্রথমে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নেওয়া। সাংবাদিকতার পাশাপাশি ছোট গল্প ও কবিতা লেখার অভ্যাসটাও তাঁর সহজাত।*

# আমার হেডমাস্টারমশাই

## সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমার গ্রামের স্কুল কামালপুর হাই স্কুল। সেখান থেকে মাধ্যমিক পাশ করে কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের পদধূলিধন্য বলাগড় হাই স্কুলে ভর্তি হতে এলাম। বড় স্কুল বাড়ি। বারান্দায় দেখলাম ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত একজন সৌম্যকান্তি হেডমাস্টারমশাইকে।

ক্লাস শুরু হল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্লাস নেবেন হেডস্যার। প্রথম দিনেই আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম। কি অসাধারণ বলার ভঙ্গী! নাটকীয়তা নয়। স্বাভাবিক। কিন্তু কী আকর্ষণীয়! একটা অধ্যায়ের শেষে প্রশ্ন দিয়ে দিতেন। উত্তর লিখে দেখাতাম। ভুলগুলো শুধরে দিতেন। তিরস্কার করেননি কোনদিন। সেবার সরস্বতী পুজোর দায়িত্ব আমাদের কাঁধে। স্যার নিজের ঘরে বসে সব তদারকি করছেন। সন্ধ্যা হল। আমরা রাতে থাকব। প্যান্ডেলের কাজ বাকি। স্যার বললেন, 'তোমরা আগে খেয়ে নাও। একটু গান বাজনার আয়োজন করছি।' আমার তখন হাওয়াইন গিটার। গুটিকয়েক রবীন্দ্রসঙ্গীত তুলেছি। স্যার আমার কোন বন্ধুদের থেকে জানতে পেরেছেন। আমাকে গিটার বাজাতে হবে। আমি ইতস্তত করছি। স্যার বললেন, 'তুই তো ঘরোয়া জলসায় বাজাচ্ছিস। তোর গিটার শুনে আমি বাড়ি যাব।' আমি বাজিয়েছিলাম। ফুটবল খেলার মাঠে—স্যার। বার্ষিক স্পোর্টস—স্যার উৎসাহ দিচ্ছেন।

হেডস্যারের বাড়ি ছিল বাখনাপাড়া। বলাগড়ে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। সত্যব্রত, স্যারের ভাগ্নে, আমাদের সঙ্গে পড়ত। একদিন ওর সঙ্গে স্যারের ঘরটা দেখতে গেছি। চারিদিকে অজস্র বই। একটা চৌকির ওপর বসে ঝুঁকে কিছু লিখছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, 'আয় বস'। অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম বইগুলোর দিকে। একজন জ্ঞানতাপসকে প্রত্যক্ষ করছিলাম।



তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। আমার জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে গেছেন স্যার। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজনে স্যারের পরামর্শ নিয়েছি। আমাকে একটা বিশেষ কোর্সে ভর্তি করাবেন বলে নিজে ভর্তি হয়েছেন। আমরা গ্রামে বিজ্ঞান ক্লাব তৈরি করেছি, উনি বক্তৃতা দিয়েছেন। বাখনাপাড়ার বাড়িতে গিয়েছি। দেখেছি একজন মুক্তমনা মানুষের জীবনের অংশ। পরে কালনায় বাড়ি করে চলে এসেছিলেন। তখন আমরা আলোচনা করি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। আলোচনা ঠিক নয়, এক একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করি, স্যার বলে যান, আমি শুনি। সম্ভবত মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী স্যার ভারতীয় দর্শনে ধ্বনিসর্বস্ব শ্লোকের বিরুদ্ধাচরণ এক সময়ে করতেন। অনেক কথা ঠেসে ঠেসে একটা শ্লোকের মাধ্যমে বলার যে দক্ষতা—তাকে তিনি খুব বেশি গ্রাহ্য না করে এই পদ্ধতিতে জটিলতা অনেক বেড়ে যায় বলে মনে করতেন।

সেদিন রবিবার। দুপুরের দিকে আমি গেছি। নিজেই দরজা খুলে দিলেন। একটা বই আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'তোর কথাই কদিন ধরে ভাবছিলাম। এই বইটা তুই অনুবাদ করে দে।' উল্টে পাল্টে দেখছি। স্যার বললেন, 'পারবি তুই। তাড়াহুড়ো নেই। আস্তে আস্তে করিস। হয়ে গেলে এমন রবিবার দেখে চলে আসবি।' আরও কিছুক্ষণ গল্প করে সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ি চলে এলাম। পরদিন প্রথম ক্লাস নিচ্ছি। স্কুলের টেলিফোনে আমার স্ত্রী সুতপার ফোন, 'হেডস্যার আজ সকালে চলে গেছেন।' কিছুক্ষণের জন্য মাথাটা ফাঁকা হয়ে গেল। পরক্ষণেই ছুটতে ছুটতে ট্রেন ধরলাম। যখন পৌঁছলাম স্যারের দেহ বর্ধমান মেডিকেল কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। স্যারের দেহ যে দান করা ছিল ছাত্রদের জন্য। দূর থেকে হাতজোড় করে প্রণাম জানালাম। আমার হেডস্যার, দুর্গাপদ সরকার, এখনও আমার কাছে, আমার মনের মণিকোঠায় সযত্নে রয়েছেন।

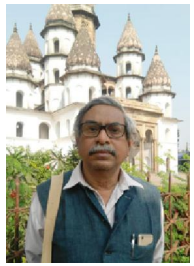

**লেখক পরিচিতি**—*শিক্ষক ও গবেষক। এশিয়াটিক সোসাইটির আজীবন সদস্য। জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস ও পুঁথিবিদ্যায় বিশেষ আগ্রহ। জাতীয় পাণ্ডুলিপি মিশন, দিল্লি থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ : ১) ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ২) সোমসিদ্ধান্ত। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমিতে প্রজেক্ট ইনভেস্টিগেটর হিসাবে কাজ। দেশে বিদেশে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ, সেমিনারের অভিজ্ঞতা।*

# আমার স্কুল আমার শিক্ষক

## সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রিয় শিক্ষককে নিয়ে লিখতে বসে কেন হোঁচট খেতে হলো। কাগজের ওপর গোটাগোটা হরফে লখা শুরু করতেই মনোপথ বেয়ে অনেকগুলো উজ্জ্বল মুখ এসে যেন দাঁড়ালো আমার লেখনির পথ আগলে। আমার মনোপটে এখন অনেক অনেক মানুষের উজ্জ্বল উদ্ভাস। তাঁদের সকলের সামনে নিজের ভারিক্কি চেহারাটাও নিমেষে ভ্যানিশ। ঠিক যেন—ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল। ঘোর কাটতেই মনে হলো অনেকটা সময় পেরিয়ে এসে হাজির হয়েছি এক সব পেয়েছির দেশে, আমার ফেলে আসা আশ্চর্য স্কুলবেলায়। আর স্কুলবেলাতে ফিরতেই মনে হলো—এতসব আশ্চর্য মানুষের মধ্য থেকে কাকে আলাদা করে বাছব প্রিয়তমের তকমা সেঁটে দেবার জন্য! আমার শিক্ষাজীবনের শুরুর সেই সহজ, সরল, অনাবিল অথচ আনন্দময় দিনগুলোতে যাঁরা আমাকে ঘিরে রেখেছিলেন পরম মমতায়, শাসনে আর অফুরান ভালোবাসার আশ্চর্য যুগলবন্দিতে তাঁরা সকলেই যে আমার কাছে সমান প্রিয়। আজও চোখ বুজলেই সেই আনন্দবাসরে ফিরে যেতে পারি এক লহমায়, আর হয়তো তাই, কোনো এক ব্যক্তিবিশেষ নয়, আমার স্কুল, আমার স্কুলযাপনের সেই রোমাঞ্চঘন, পরম নির্মিতির দিনগুলোই আমার প্রিয় শিক্ষক।

প্রথমেই বলি আমাদের হেডমাস্টার মশাইয়ের কথা। শান্তিনিকেতনের ‘রবীন্দ্র পরিকরে’র মতো আমাদের ছিলেন ‘মিহির পরিকর’। মিহির মানেও তো রবি, সূর্য। এই নামগত সাযুজ্যটুকু আবিষ্কার করেছি অনেক পরে, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর ‘রবীন্দ্র পরিকর’ পুস্তকখানি পাঠসূত্রে। মনে প্রাণে বিশ্বাসে ও



কর্মে আমাদের হেডমাস্টারমশাই হলেন পরোদস্তুর রবীন্দ্র ভাবানুসারী। তাঁর হাতেই পত্তন আমাদের স্কুলের—আমাদের শহুরে শান্তিনিকেতনের। ধারাবাহিক রুটিনের নিয়মে কোনো দিনই আমরা তাঁকে ক্লাসের চৌহদ্দিতে বাঁধা পড়তে দেখিনি সেভাবে। দীর্ঘ, ঋজু, বলিষ্ঠ অবয়বের এই মানুষটি আমাদের শিশিক্ষু করে তুলতে নিরলস সৃষ্টিতে মেতে ছিলেন। তাঁর হাতেই কিশোরভারতীয় যাপনের লালন-পালন পরিবর্ধন। তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন জীবনটাকে অনেক বড় ক্যানভাসে মেলে দেখতে। শুধু পুঁথি পড়া অনেক নম্বর পাওয়া ছাত্রের নির্মাণ নয়, চাই যথার্থ মানুষ যারা মানুষের পাশে দাঁড়াবে বিপদে-আপদে, উল্লাস আর উৎসবে। ‘চরৈবেতি, চরৈবেতি’ এই শাশ্বত মর্মবাণীকে আগলে রেখেই তিনি আমাদের পথ চলতে শিখিয়েছেন বিসারি জীবনপথে। আমরা ‘মিহিরবাবুর ছাত্র’, এটাই হলো আমাদের সব থেকে সেরা অভিজ্ঞান।

কিন্তু সবটাইতো আর একা হাতে করেননি। দক্ষ মালাকরের মত নিজেই চয়ন করে এনেছিলেন তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত সব সহচরদের। গৌরীদি, পূরবীদি, নিভাদি, মায়াদি, শঙ্করীদি, শঙ্করদা, দিলীপদার মতো আশ্চর্য মানুষদের। সৌরমণ্ডলের গ্রহরাজির মতো নিরন্তর তাঁরা তাঁদের ভাবনার সুবাসে আমোদিত করেছেন আমাদের তৃষ্ণালু মনকে। এই সমস্ত দাদা-দিদিদের সাহচর্যে শৈশবের নরম তুলতুলে মনগুলো আস্তে আস্তে ভরপুর হয়েছে নানান ভাব ও ভাবনার বিচিত্র সম্ভারে। ছোট্ট স্কুলটা একটু একটু করে বড় হয়েছে এঁদের অনলস অভিভাবকত্বে। পরবর্তীকালে যাঁরা আমাদের আগলাতে এলেন সেই দীপকদা, পুর্ণিমাদি, হেনাদি, কুন্তলাদি, প্রবীরদা, সুব্রতদা, সমরজিৎদা, পারুলদি—সকলেই সেই পারিবারিক শৃঙ্খলাকে মান্যতা দিয়েই পথ চলেছেন আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে। আজ যেটুকু পরিচিতি, যেটুকু সামর্থ্য অর্জন করেছি তার সবটুকুর কৃতিত্ব আমার ছেলেবেলার স্কুলের, আমার প্রাণের সেই আশ্চর্য উৎসসূত্রের।

**লেখক পরিচিতি**—*অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, দমদম কিশোর ভারতী হাই স্কুল। ভালবাসার বিষয়—লেখালেখি, নাটক রচনা, উদ্যানচর্চা। কিশোর ভারতী উন্নয়ন সংস্থার ত্রৈমাসিক মুখপত্র শিক্ষাবার্তা-র সম্পাদক।*

# ‘আমার স্কুল’ থেকে ‘আমাদের স্কুল’

## সজল রায়চৌধুরী

স্কুলজীবনের সব শিক্ষকই আমার প্রিয়। যে কঠিন অবস্থার মধ্যে তাঁরা আমাদের পড়াতেন তাতে শ্রদ্ধা এবং দুঃখে মাথা নত হয়ে আসে। শহরে তাঁরাও থাকতেন, আমরাও। সবার বাড়ি চিনতাম। সবাই দরিদ্র ছিলেন।

একই স্কুলে কৃষক, ছোটো দোকানদার, মিস্ত্রি ও এস ডি ও-র পরিবারের ছেলেরা পড়ত। অনেকেই প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া। ইউনিফর্মের বালাই ছিল না। কৃষক পরিবারের ছাত্ররা সাধারণত পরিবারের ছোটো ছেলে হত। দাদারা চাষবাস করত। ছোটো ভাইটাকে স্কুলে পাঠাত। লুঙ্গি পরে স্কুলে আসায় কোনো বাধা ছিল না। অনেকে দুটো খেয়া পেরিয়ে আসত। আমরা শহরের ছেলেরা তাদের কষ্ট বুঝতাম বলে মনে পড়ছে না।

ছাত্রদের মধ্যে কোনোরকম তুচ্ছতাচ্ছিল্য কাউকে করা হত না। কিন্তু শিক্ষকরা মনে হত ভালো ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে পড়াতেন। পড়া আমাদেরই ধরতেন অথবা আমরা হাত তুলে প্রশ্ন করতাম বা উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিতাম। কিছু লিখতে দিলে আমাদের খাতাই আগে জমা পড়ত। সেগুলো দেখতে দেখতেই ঘন্টা কাবার। পরে ভেবে দেখেছি, ইংরেজ প্রবর্তিত স্কুল সিস্টেমে প্রথম দু-তিন বেঞ্চের পর পড়ুয়ারা এলেবেলে হয়ে পড়ত। শিক্ষকদের যে কী করা উচিত আমি শিক্ষক হয়েও সেটা বুঝে উঠতে পারিনি। তথাকথিত ‘খারাপ’ ছেলেমেয়েদের জন্য কীভাবে পড়ানো যায়, সেটা ভাবাই দরকার। যারা স্কুলে আসে তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য আলাদা। কারো সাতপুরুষ অক্ষরের জগতে ঢোকার সুযোগ পায়নি, কারো বাড়িতে বইপত্তর বোঝাই। বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাইরা সমাজে ‘ভদ্রলোক’ বলে গণ্য। অন্যরা ‘ছোটোলোক’।

ভদ্রলোকরা সমাজের প্রধান। শিক্ষিতই বেশিরভাগ। ছোটোলোকরা



অশিক্ষিত। এই অবস্থান থেকে মূল্যবোধ একটা তৈরি হয়, লেখাপড়া সবার জন্য নয়। বাংলার একটা প্রবাদ আছে, ‘সব নোড়ায় যদি শালগ্রাম হত লোকে বাটনা বাটত কী দিয়ে’। তাহলে কিছু লোক প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাটনাই বাটবে আর অল্প কিছু লোকের জন্য শালগ্রাম শিলার সিংহাসন বরাদ্দ।

মাথার কাজ হাতের কাজের ওপরে। এই বাইনারিতে কাজ ও তার মূল্য নির্ধারণ ক্ষমতাতন্ত্রের হাতে তৈরি। যেমন ধরা যাক, রাজমিস্ত্রির কাজ। এটাতে কি শুধু এলোপাথাড়ি হাত চালালেই হয়? পরম্পরাগতভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা না জানলে অর্থাৎ মাথায় ইমারতের ভারসাম্য ও অঙ্গসংগঠনের জ্ঞান না থাকলে সে কিছুই পারবে না। অন্যদিকে, লেখাপড়ার মধ্যে কি শরীরের প্রধান অঙ্গ মস্তিষ্কের অনুশীলন নেই?

আসলে সমাজের দুই স্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষার অধিকার হাজার বছর ধরে নামে-বেনামে ওপরের স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজরা এসে ঘোষণা করল সবাইকে শেখানোর দরকার নেই। ওপরতলার শিক্ষা। সেটাই চুঁইয়ে নীচে পড়বে। এটাই শিক্ষাক্ষেত্রে downward filtration theory. ওপরতলার সামাজিক শক্তির সবরকম বাধার বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে লড়ে নিচুতলার দু-একজন উঠতে পারলে বাবুসমাজ তাঁদের কো-অপ্ট করে নেয়। সেই ব্যক্তিরা প্রায়শই নিজের উৎসভূমি থেকে নিজেদের ছিন্ন করে নেয়।

আমাদের স্কুল ব্যবস্থা, পরীক্ষা ব্যবস্থায় এরই প্রতিফলন দেখতে পাই। সমাজের বঞ্চিতরা শ্রেণিকক্ষেও কাঠামোগত বঞ্চনার আর এক দফা শিকার হয়। বর্তমানে গজিয়ে উঠেছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আর্থিক অবস্থানগত বৈষম্য। শিক্ষার ওপর এই বৈষম্যের গুরুতর কুপ্রভাব পড়ছে।

তবুও অনেক শিক্ষকের মনে যে একটা অতৃপ্তি (যা করতে চাই করতে পারছি না) কাজ করছে। অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন নিজেদের মতো করে, সেখানেই আমাদের ভরসা।

**লেখক পরিচিতি**—*ছত্রিশ বছর গ্রাম ও শহরের হতদরিদ্র অঞ্চলের সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কুড়ি বছর ধরে মাতৃভাষার অধিকার আন্দোলনের সহযোগী। গত আট বছর ‘মাতৃভাষা’ পত্রিকার সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির, আইভান ইলিচ ও পাউলো ফ্রেইরের শিক্ষানীতির প্রচারক।*

# ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি

## শুভজিৎ চট্টোপাধ্যায়

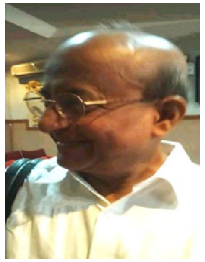

সাল ১৯৯১, আগস্ট মাসের দুপুর। সাদা জামা, কর্ডের প্যান্ট এবং পায়ের জুতোর বেলট না বাঁধা এক নবীন শিক্ষক অত্যন্ত দ্রুততায় ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে হাসি হাসি মুখে শিশুসুলভ চাহনিতে বললেন, 'আমি তোমাদের রাজসিংহ পড়াব।' তারপর এক ঘন্টা ধরে চলল বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব, অনুশীলনতত্ত্বের গূঢ় ব্যাখ্যা। কেন বঙ্কিম 'চারিবৃত্তির' অনুশীলনের কথা বলেছেন তার চুলচেরা বিশ্লেষণ। প্রায় প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে দিলেন 'চটি'। রাজসিংহ 'ক্ষুদ্রকথা'র সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য। আমি তখন মন্ত্রমুগ্ধ। পুরো পড়ানো শেষে বললেন, 'আশা করি তোমরা রাজসিংহ পড়ে এসেছ।' সত্যি বলতে দ্বিধা নেই—কিছুই পড়া হয়নি। বাড়ি ফিরে সন্ধ্যায় শুরু করে ভোর অবধি বাবার বঙ্কিম রচনাবলী খুলে একে একে পড়ে ফেললাম পুরো উপন্যাস। দুদিন পরে বেশ গর্ব করে ক্লাসে সেটা বলতেই বললেন, 'এবার এক সপ্তাহের মধ্যে আনন্দমঠ, সীতারাম, আর দেবী চৌধুরাণী পড়ে এসো। তা না হলে বঙ্কিম বোঝা মুশকিল। এ ছাড়াও পড়বে ...' বলে প্রায় দশটা বইয়ের নাম বললেন। বললাম, 'স্যার, সবগুলো বই তো নেই। আসলে বঙ্কিম রচনাবলী ছাড়া প্রায় কিছুই নেই।' বললেন, 'ঠিক আছে।'

ঠিক এক সপ্তাহ পরে দেখি বঙ্কিম জীবনী, উনিশ শতক সম্পর্কে গোটা তিনেক বই ক্লাস শেষে হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'আশা করি তুমি দুই সপ্তাহের



মধ্যে পড়ে ফেলতে পারবে।'

এমনই অধ্যাপক ছিলেন তপোব্রত ঘোষ। সামান্য ভুল করলেই জুটত নির্মম সমালোচনা। একটা গোটা লেখা পড়ে তিনি প্রায় পুরোটাই আবার লিখে দিতেন, যেখানে যেখানে ভুল হয়েছে এবং কেন ভুল হয়েছে তার সবটাই বুঝিয়ে দিতেন। স্যারের কাছেই শিখেছি—ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ লাগার ওপর সাহিত্য দাঁড়িয়ে থাকে না। সাহিত্য হল 'স্বহৃদয়সংবেদী।' সাহিত্যের অন্তর্গত বিষয়ে অনুপুঙ্খ সমালোচনা ব্যক্তিনিরপেক্ষ। আর তাই যে সাহিত্যিকের কথা আলোচনা করা হবে তাকে আমরা আমাদের কালে পাব না। পাব তাঁর কাল বা সময়ের কথা। স্যারের মাস্টারমশাই অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য 'কবিমানসী' গ্রন্থে এইভাবেই বাংলা জীবনীমূলক সমালোচনার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন পরবর্তী কালের সামনে।

স্যার বলতেন, 'হাতে পেনসিল নিয়ে পড়তে বসবে। প্রতিটি শব্দ নিয়ে ভাববে।' ঘড়ি ধরে ক্লাস নেবার পরেও বহুক্ষণ নিজের ঘরে বসে উত্তর দিতেন আমাদের সব প্রশ্নের। পাশে পড়ে থাকত ঠাণ্ডা চা, পাউরুটি। শেষে কাঁধের ভারি ব্যাগ নিয়ে করিডর থেকে বেরিয়ে বাসে ওঠার আগে জেনে নিতেন সকলের কাছে বাড়ি ফেরার পয়সা আছে কি না। মুখে লেগে থাকত সহজ-সরল হাসিটি।

যেদিন স্কুলে চাকরি পেলাম স্যারকে প্রণাম করতে গেলে বললেন, 'বাচ্চাদের পড়ানো শক্ত কাজ। কিন্তু জানো তো ওতেই প্রকৃত আনন্দ আছে।'

এখনো একটি ভুল করলে বলেন, 'এই জ্ঞান নিয়ে স্কুলে পড়াও কি করে!'

প্রতি মুহূর্তে তাঁর ললিত-কঠোর রূপের যে দর্শন পেয়েছি তা অপরিশোধ্য। নিজের জীবনেও তিনি পেয়েছেন নানা গঞ্জনা, অপবাদ, কিন্তু কখনোই তিনি সরে আসেননি অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে। শিক্ষক দিবসের পুণ্যলগ্নে 'স্যার' এর চরণে রইল আমার বিনম্র প্রণতি।

**লেখক পরিচিতি**—*বিশিষ্ট শিক্ষক, সাউথ গড়িয়া যদুনাথ বিদ্যামন্দির। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর। কবি, প্রাবন্ধিক।*

# নিভৃত প্রাণের দেবতা

## তাপস মুখোপাধ্যায়

জীবনে চলার পথে পাশে পেয়েছি বেশ কিছু মানুষকে যাঁরা আমার পথকে সুন্দরতর করেছেন, সুসজ্জিত করেছেন। তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। পরিবার পরিজন, বন্ধু বান্ধব, শিক্ষক শিক্ষিকা সবাই চিহ্ন রেখে গেছেন আমার জীবনে।

তবুও, যখন আদর্শ শিক্ষক হিসাবে কারো কথা ভাবি তখন শুধু তিনি কী শিখিয়েছেন তা নয়, কী জীবনদর্শন মেলে ধরেছেন আমার ছোট্ট দুটো চোখের সামনে সেটা বেশি অনুপ্রাণিত করে।

মনে পড়ে প্রথম দিনের শ্রেণিকক্ষে তাঁর এসে দাঁড়ানো। সাদা ধুতি পাঞ্জাবিতে আদর্শ শিক্ষকের বেশে। মনে পড়ে তাঁর প্রথম দিনের কিছু শব্দ, 'রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন, সূর্যের মতন'।

সেই শুরু যাত্রা পথ, শুধু কিছু শব্দের বিনিময়ে। বুঝলাম, কিছু শব্দ মানুষকে অন্তর থেকে জাগ্রত করে, অদম্য ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। বুঝলাম, আদর্শ শিক্ষক শুধু জীবন পথে আলো প্রদান করেন না, আমাদের অন্তর্নিহিত আলোকে সমাজের কাছে মেলে ধরতে অনুপ্রাণিত করেন।

কিছু শিক্ষক মই বেয়ে ওঠা শিখিয়েছেন, আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তিনি শিখিয়েছেন ওঠার আগেই মইটাকে ঠিক স্থানে রাখতে। এটা তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয়।

তখন আমি মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র। মাননীয় সুধীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে আদর্শ শিক্ষকের যে ভাবমূর্তি পেয়েছি তা আমার জীবন পথে এক



সুন্দর উপহার। তিনি আমার জীবনের ধ্রুবতারা, তিনিই আমার নিভৃত প্রাণের দেবতা। তিনি আমাদের স্কুলের বাংলার শিক্ষক। কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচয় ক্ষণিকের হলেও তাঁরা জীবনপথে চিহ্ন রেখে যান চিরকালের জন্য। সুধীরবাবু তাঁদেরই একজন।

একদিন শ্রেণিকক্ষে তিনি বললেন, 'তোমাদের জীবন এক একটা পাথরের টুকরো। প্রতিদিনের নিজের কাজ বা অকাজ সেই পাথরের টুকরোকে একটু একটু করে পরিবর্তিত করবে। জীবনের শেষে দেখবে নিজেকে নিজের হাতে ঠিক কি ভাবে গড়েছো।' শুধু শব্দচয়ন বা উদাহরণ নয়, জীবনের দায়িত্ব সেদিন তিনি তুলে নিতে শিখিয়েছিলেন নিজের হাতে।

বাঙালি যেমন বহু কাব্য পাঠ করেও রবীন্দ্রনাথকেই রেখেছে মনের মন্দিরের পবিত্র আসনে, ঠিক তেমনই বহু শিক্ষক পাওয়া সত্ত্বেও সুধীরবাবু থাকবেন 'নীরবে হৃদয়ে মম'।

আজকের এই বিশেষ দিনে শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইকে স্মরণ করতে পেরে ভাল লাগছে। জানি না এই লেখা কোনোদিন তাঁর কাছে পৌঁছাবে কিনা। শুধু জানি—'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে'।

**লেখক পরিচিতি**—*কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি টেক করার পর বিগত প্রায় কুড়ি বছর ভারত, অস্ট্রেলিয়া, সংযুক্ত আরব আমীরশাহী সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা। অবসর সময়ে ইংরেজি ভাষায় অনুপ্রেরণামূলক বই লিখতে পছন্দ করেন।*

# যাঁদের কাছে শিখেছি

## প্রশান্ত ভট্টাচার্য

স্কুলজীবনের অনেক শিক্ষকের কথাই মনে পড়ে। আমাদের প্রাইমারি স্কুলের প্রবীণ হেডস্যারের কাছে শিখেছি অনেক কিছু। বিভিন্ন শব্দের সঠিক উচ্চারণ, শৃঙ্খলা, দলগত সংহতি, নেতৃত্ব দান, সৃজনশীলতা। উনি সবকিছু নিজের হাতে করতে বলতেন। আজ তিনি অনেক দূরে, হয়তো বা অন্য কোনো গ্রহে।

প্রায় একই সময়ে অন্য এক স্যারের সঙ্গে আলাপ হয় আমার। আমাদের স্কুল সংলগ্ন মাঠে আমরা ছুটির পরেও অনেক সময় খেলতাম। পাশেই ছিল একটি ছোট্ট পুরোনো রংচটা হোস্টেল। সেখানে আমাদের উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা থাকতেন। আমরা হোস্টেলের বালিঝরা দেয়ালে একের পর এক বল মেরে যেতাম। মাঝে মাঝে হোস্টেলের ভেতর থেকে এক বয়স্ক শিক্ষক বেরিয়ে আসতেন। কাছে এসে আমাদের অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করতেন। এভাবেই স্যারের সঙ্গে পরিচয়। উনি আসতেন পাশের একটি গ্রাম থেকে সাইকেলে করে। হাই স্কুলে উঠে সায়েন্স পড়া তাঁর কাছে। হোস্টেলের ঘরে পড়তে গেলে আমাকে বলতেন, 'বোদা, চা আর বিস্কুট নিয়ে আয়'। অনেকদিন এমনও হয়েছে যে হোস্টেলে স্যারের রান্নাটা আমরাই চাপিয়ে দিতাম। আজ এতদিন পরে মনে হয়, উনি শুধু আমাদের সায়েন্স শেখাননি। ওই প্রত্যন্ত গ্রামে উনি ছোট ছোট ছেলেগুলোকে স্বপ্ন দেখাতেন, যে তারাও একদিন ভবিষ্যতে অনেক বড় হতে পারে, শিক্ষক হতে পারে, দেশের জন্য কিছু অবদান রাখতে পারে!

ছোটবেলায় ইংরেজি ভাষায় হাতেখড়ি হয় আমাদেরই পাড়ার এক প্রাইভেট টিউটরের কাছে। বাংলা মিডিয়ামে পড়তাম আমরা, কিন্তু এই ইংরেজির শিক্ষক



আমাদের ইংরেজি গ্রামার শিখিয়েছিলেন খুব সহজভাবে। ইংরেজি শিক্ষার যে ভিতটা স্যার গড়ে দিয়েছিলেন, তার ওপর ভিত্তি করে আজও আমরা নিজ নিজ পেশায় সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছি। সঠিক শিক্ষার মূল্যায়ন সবসময় তৎক্ষণাৎ হয় না। শিক্ষার প্রভাব পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন রূপে ধরা পড়ে, যেটা আমি অনুভব করেছি।

মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষায় অঙ্কে পেয়েছিলাম মাত্র ষাট। আমার বাবা আমাকে পাঠালেন এক নতুন অঙ্ক শিক্ষকের কাছে, তিন মাসের জন্য। সকাল সাতটা থেকে দশটা—এই তিন ঘণ্টা গভীর অনুশীলন। বড় অদ্ভুত মানুষ ছিলেন উনি। বলতেন, 'টাকা নিয়ে আর যাই হোক পড়ানো যায় না।' উনি আমাকে শিখিয়েছিলেন যে প্রত্যেকটা অঙ্কের সমস্যার মধ্যে কোথাও না কোথাও সমাধান-সূত্র লুকিয়ে থাকে এবং সেটি খুঁজে বের করতে হয়। তাঁর কাছে পড়ার পর মনে হতো যত কঠিন হোক না কেন, আমি যে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারব। ওর মুখে শুনতাম যে জীবনে বড় হওয়ার প্রকৃত অর্থ শুধু কিছু অর্থ, সম্মান উপার্জন নয়, এর পাশাপাশি মানুষ হিসাবে সমাজের কাজে আসাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আমায় শিখিছিলেন জীবনটাকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় সঠিক ও সার্থকভাবে।

আর একজন শিক্ষকের কথা না বললেই নয়। তিনি ছিলেন আমাদের হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রশাসনিক নৈপুণ্য ও সর্বোপরি ইংরেজি সাহিত্যের উপর দখল তাঁকে এক বিশিষ্ট আসনে বসিয়েছিল।

সব শিক্ষার শুরু হয় বাড়ি থেকে। আমার বাবা বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নিজে শিক্ষক ছিলেন। তাঁর কাছে আমি তেমন কোনো পুথিগত শিক্ষা পাইনি। কিন্তু যেটা পেয়েছি, সেটা হয়তো আমার জীবনের সবথেকে বড় শিক্ষা এবং পাথেয়। মানুষ হতে শিখিয়েছিলেন তিনি।

এইসব অবিস্মরণীয় শিক্ষকদের আমার প্রণাম জানাই।

**লেখক পরিচিতি**—*পেশায় তথ্যপ্রযুক্তি ইঞ্জিনিয়ার। শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশনের পর গত দুই দশক তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থায় কাজ করেছেন। কর্মজগতের বাইরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত।*

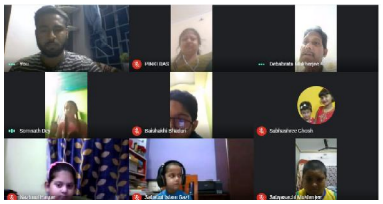

অনলাইনে শিক্ষার্থীদের নিয়ে কৃমি সচেতনতা দিবস পালন
অনলাইনে অনুসন্ধানের কর্মশালা : মানসিক অবসাদ
Webinar on MADHYAMIK ENGLISH
জীববিদ্যার চর্চা করুন
অনুসন্ধান | কলকাতা
শিক্ষক দিবস উদযাপন
5 সেপ্টেম্বর
বিকাল 4:30
উদ্বোধক অধ্যাপক সুগত বসু
সম্মাননা জ্ঞাপন
বিশেষ আকর্ষণ
বিশ্বের ক্ষুদ্রতম স্যাটেলাইট নিয়ে রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা
সমর বাগচী
দিব্যগোপাল ঘটক
জোসনারা বেগম
ড. মানস প্রতিম দাস
রিফাত শাহরুখ
উদ্বোধনী সংগীত ঋষি চক্রবর্তী
zoom অনলাইন
অনুসন্ধান